# প্র. না. বি-র নিকৃষ্টতর গল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—তিন টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে ভানু রায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পরিচয় প্রেস, ৮বি দীনবন্ধু লেন হইতে
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

করকমলে

# ভূমিকা

সহৃদয় পাঠক,

নিকৃষ্ট গল্প প্রকাশের সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে শীঘ্রই নিকৃষ্টতর গল্প প্রকাশিত হইবে। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইল না বলিয়া আশা করি পাঠকসমাজ আমাকে ধন্যবাদ দিবেন। অতঃপর নিকৃষ্টতমর পালা। সেজন্য কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে বটে, কোন্‌গুলি সবচেয়ে নিকৃষ্ট তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বিচার-সাপেক্ষ।

প্র. না. বি

# পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস

সকলেই জানেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল আণবিক বোমা, আর চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র অস্ত্র ছিল লাঠি-সোটা ও ইঁট-পাটকেল।

এ সব এখন প্রাচীন ইতিহাসের অন্তর্গত। এবারে পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইতেছে। এ বৃত্তান্ত অন্যান্য বিশ্বযুদ্ধের মতো সুপরিজ্ঞাত না হইলেও একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়, অনেকেরই জানিবার কথা। তবু বাহুল্যভয় না মানিয়া যে লিখিতেছি, তাহাব কারণ ভালো কথার যত প্রচার হয়, ততই মঙ্গল।

'নিরীহ-দংশন' নামে এক ব্যাঘ্র-যুবা শিকার করিবার উদ্দেশ্যে একদিন এক লোকালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু লোকালয়টি লোকবিহীন হওয়ায় কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না, শিকার করিবে কি ? অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করিবার ফলে ক্লান্ত হইয়া এক সরোবরকূলে বসিল, এবং পাশেই হাতের তীর-ধনুক রাখিয়া দিয়া সে ঘাসের উপরে শুইয়া পড়িল।

নিরীহ-দংশন দুঃখিত মনে ভাবিতে লাগিল, হায়, আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি। শিকারযোগ্য একটিও মানুষ পাইলাম না। মাঝ হইতে তীরধনুক বহিয়া হাত ব্যথা হইয়া গেল! সে ভাবিল, আগেকার দিন থাকিলে

এই কষ্টটা হইত না, নখদন্তেই কাজ সারিতাম, কিন্তু এখন ত আর তা হইবার জো নাই, কেননা, এখন আমরা সভ্য হইয়াছি। সে আরও ভাবিল যে এ বিষয়ে মানুষের বেশ সুবিধা, নখদন্তে তাহারা কার্যোদ্ধার করে। তবে শুনিতে পাই যে, এক সময়ে তাহাদেরও নাকি আমাদের মতো অবস্থা ছিল, অস্ত্র ছাড়া নখদন্ত ব্যবহার করিতে পারিত না। সে গবেষণা করিয়া ফেলিল যে, তখন মানুষ সভ্য ছিল, এখন আমরা যেমন সভ্য!

দুত্তোর সভ্যতার নিকুচি করি—বলিয়া যেমনি সে উঠিয়া বসিল অমনি দেখিতে পাইল, অদূরে সরোবর সোপানে উপবিষ্ট একটি মানুষ অর্থাৎ একটি মানবী তরুণী ও সুন্দরী।

মেয়েটিও নিরীহ-দংশনকে দেখিয়াছে বুঝিতে পারা গেল কেননা তাহার চোখে এক অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। সেই মায়াবিনী নখ খুঁটিবার ছলে বসিয়া বসিয়া সরোবরজলে ব্যাঘ্র যুবকের ছায়াটি দেখিতে লাগিল।

তখন নিরীহ-দংশন মৃদু পায়ে কাছে আসিয়া ডাকিল—

হালুম হুলুম, হালুম হুলুম। মেয়েটি কোন উত্তর দিল না।

নিরীহ-দংশন আবার হাঁকিল হালুম হুলুম ইত্যাদি।

এইরূপ তিন চারিবার হাঁকিবার পরে মেয়েটি সলজ্জ কণ্ঠে সসম্ভ্রমে বলিল—হাম হুম হাম।

নিরীহ-দংশন বলিল,—হুম হুম ধুম।

মেয়েটি বলিল,—হুঁ হুঁ হুম!

পাঠক তুমি এতক্ষণে নিশ্চয় ভাবিতে সুরু করিয়াছ যে, কাহার মাথা খারাপ—লেখকের, মেয়েটির না তোমার নিজের।

আমি বলিব, অত বাছবিচার করিয়া কাজ নাই, আমাদের তিনপক্ষেরই মাথা খারাপ।

মেয়েটির মাথা খারাপ, নতুবা মনুষ্যেতর ভাষায় সে কথা বলিবে কেন?

লেখকের মাথা খারাপ, নতুবা চোরাকারবারে আত্মনিয়োগ না করিয়া লিখিতে যাইবে কেন ?

আর সর্বোপরি, পাঠক, তোমার মাথা খারাপ, নতুবা জগতে এত কাজ থাকিতে তুমি এই রচনা পড়িতে বসিবে কেন ?

যাই হোক, তিন পক্ষেরই যখন মাথা খারাপ তখন পরস্পরের ভাষা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। সংসারে সকলেই পাগল হইলে পাগলা-গারদ তৈয়ারির খরচ বাঁচিয়া যায়।

এখন হইতে নিরীহ-দংশন আর মেয়েটির কথোপকথনের মূল ভাষা ব্যবহার না করিয়া তরলমতি পাঠক-পাঠিকার বোধসৌকর্যার্থে তাহার অনুবাদটিই ব্যবহার করিব।

নিরীহ-দংশন শুধাইল,—সুন্দরী, তোমার নাম কি ?

মেয়েটি বলিল—উঁচকপালী।

নিরীহ-দংশন পুনরপি শুধাইল,—তোমার পিতার নাম কি ?

—ক্ষুদ্রপুচ্ছ।

—তিনি কি করেন ?

— তিনি এই জনপদের রাজা।

নিরীহ-দংশন খুশী হইয়া বলিল,—তাহলে রাজবংশে তোমার জন্ম ? তারপরে সে বলিল,—আমারও রাজবংশে জন্ম, আমার পিতা বৃহৎপুচ্ছ—এই বনের পশুপতি। অতএব তুমি আমার অযোগ্যা নও।

তখন সে একটু নীরবে থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল, শোনো সুন্দরী, আমি তোমার রূপে মুগ্ধ, আমি তোমাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করি।

মেয়েটি সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। বোধ করি, স্বাভাবিক লজ্জাবশেই পারিল না। নিরীহ-দংশন বলিল—আমাকে কি তুমি অযোগ্য মনে করো ?

মেয়েটি বলিল—ও কথা কেন বলছেন ? ওতে যে আমার অপরাধ হয়।

তবে আপনার প্রস্তাবের উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই,—আপনি আমার পিতার কাছে প্রস্তাব পাঠাবেন।

এই বলিয়া মেয়েটি গৃহের দিকে যাত্রা করিল, যাইবার পূর্বে নিরীহ-দংশনকে লক্ষ্য করিয়া একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। নিরীহদংশন ভাবিল, মানুষের হাতে এমন অস্ত্র থাকিতে তীরধনুকে তাহার কি প্রয়োজন ?

শরাহত নিরীহ-দংশন বাড়ীর দিকে প্রস্থান করিল।

২

নিরীহ-দংশন পিতা বৃহৎপুচ্ছকে বলিল— পিতা আমি একটি মানব-কন্যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করি।

বৃহৎপুচ্ছ বলিল এ অতি উত্তম প্রস্তাব। মানুষের কন্যা আমার ঘরে এলে, আমার শ্রীবৃদ্ধি হবে। সে আরও বলিল—মানুষের পূর্বপ্রতাপের ও সভ্যতার স্মৃতির কিছু কিছু আমার জানা আছে, তোমাদের অবশ্য নাই। যাই-হোক, আমি পাত্র-মিত্রদিগকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।

পাত্রমিত্রদের সকলেরই অল্প বয়স। তাহারা মানুষের পূর্ব পরিচয় তেমন জ্ঞাত নয়। তাহারা সকলে একবাক্যে আপত্তি করিল, বলিল— নীচকুল হইতে কন্যা আসিলে আপনার ও আমাদের সকলেরই অপযশ, অতএব এমন কাজের কথাও চিন্তা করিবেন না।

কিন্তু পুত্রস্নেহান্ধ পশুপতি তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না, তিনি দূতমুখে ক্ষুদ্রপুচ্ছের নিকটে কন্যা যাচ্ঞা করিয়া প্রস্তাব পাঠাইলেন।

বৃহৎপুচ্ছের প্রস্তাব শুনিয়া ক্রোধে ও অপমানে ক্ষুদ্রপুচ্ছ মৌন রহিলেন, এমন অসম্ভব প্রস্তাব জীবনে তিনি পান নাই।

কিন্তু উঁচকপালীর ভাই ও আত্মীয়-স্বজনেরা প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিল,—বলিল, আগেই জানতাম ওর উঁচু বংশে বিয়ে হবে।

একজন বলিল,—ওর উঁচকপালী নাম থেকেই বোঝা উচিত যে, উঁচু ঘরে যাবার কপাল নিয়ে ও এসেছে।

কেহ বলিল —রাজাবাহাদুর যাই বলুন, এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। কারণ এতে মেয়ে যে কেবল সুখে থাকবে তা নয়, পশুসমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হওয়ায় আমাদের সুবিধাও অল্প হবে না।

একজন বলিল—যা বলেছ ভাই, তখন আমরা নিরাপদে বনে প্রবেশ করতে পারবো।

অপরে বলিল,—পশুরা আমাদের শালা বলবে এর চেয়ে বড গৌরব আমাদের কল্পনাতীত।

কেহবা বলিল—পশু-সমাজ এখন আমাদের চেয়ে নিজেদের উঁচু কল্পনা করে,—সেটা এইভাবে দূর হ'যে যাবে, আর তা যাওযাই দরকার। কিন্তু দেখা গেল যে, ক্ষুদ্রপুচ্ছ অটল। সে বলিল—আমি এখনো মানুষের পূর্ব গৌরবের সাক্ষী। তোমরা সব নাবালক, তোমরা সে গৌরবের কিছুই জানো না, কাজেই আশুলভ্য ফলের আশায় উদ্‌গ্রীব। কিন্তু এমন কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

এই বলিযা তিনি দূতকে জানাইলেন—মানুষ যত নীচুতেই থাকুক, তবু সে মানুষ; পশু যত উঁচুতেই উঠুক, তবু সে পশু। এমনস্থলে উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথা উঠতেই পাবে না।

দূত ফিরিয়া গেল।

সকলে বলিল—মহারাজ কাজটা ভালো হ'ল না। অপমানিত পশু-সমাজ এর প্রতিশোধ নেবে।

ক্ষুদ্রপুচ্ছ বলিল,—আমরাও ছেড়ে দেবো না, আমরাও যে মানুষ। সকলে বলিল—সেটাই তো সন্দেহের বিষয়।

৩

পাঠক, এবার তোমাতে আমাতে বোঝাপড়া। তুমি ভাবিতেছ, লেখক এ কি করিতেছে? একটা আজগবি গল্প ফাঁদিযা বসিযাছে! কিন্তু তোমার বোঝা উচিত, এটা গল্প নয়, ইতিহাস, কাজেই ইহাতে গল্পের সত্যতা

আশা করা তোমার উচিত নয়। তাহা ছাড়া এ কাহিনী ভবিষ্যতের, কাজেই অনেক পরিমাণে ইহা অবাস্তব বলিয়া বোধ হইতে বাধ্য। আজকার মানুষ দেখিয়া সেদিনকার মানুষের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না, কাজেই যাহা বলিতেছি, বিনা দ্বিধায় সে সব বিশ্বাস করিয়া যাও, অন্য উপায় তো দেখি না।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আণবিক ও পরমাণবিক বোমা এত বেশী নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, যে, তাহার বিষবাষ্পে ও গামা-রশ্মির বিচ্ছুরণে মানুষের সভ্যতা শুধু ধ্বংস হয় নাই, মানব-জাতির দেহে ও মনে অধোগতির বিবর্তন দেখা দিয়াছে। বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হওয়ায় লাঠিসোটা, ইট-পাটকেল দিয়া মানুষ চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কাহিনী এখানে বিবৃত হইতেছে।

লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, প্যারিস, মস্কো, সাংহাই, টোকিও, কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি শহর তখন অরণ্যময়। পূর্বতন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শ্বাপদ বাস করে, কোন কোন স্থানে বর্তমান মানুষের বংশধরগণ গুহা-মানব-রূপেও বাস করে বটে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই মানুষের দেহে বিবর্তনের ফলে অধোগতি দেখা দিয়াছে। মানুষের উচ্চতা কমিয়াছে, সাড়ে চার ফুট উঁচু হইলে সে মানুষকে খুব দীর্ঘকায় বলা হইয়া থাকে। তাহার গাত্র পুনরায় বনমানুষের মতো লোমশ হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকের কেশরাশি সারা গাত্রে ছড়াইয়া পড়াতে মাথার চুল পুরুষের চেয়ে আর বেশী দীর্ঘ হয় না। মানুষের পদতল শক্ত হইয়া উঠিয়া ক্ষুরের পূর্বাভাস রচনা করিয়াছে, আর কপালের দুই পাশে ছোট ছোট দুটি শিঙের মতো ও পশ্চাদ্দেশে একটি ক্ষুদ্র পুচ্ছ দেখা দিয়াছে।

আর সকলের চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, যে ভাষায় এখন আমরা কথা বলি, সে ভাষা ভুলিয়া গিয়া আধা-মানবিক আধা জান্তব এক প্রকার কিম্ভূত ভাষা সে প্রয়োগ করিয়া থাকে। এইবারে উচকপালী যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিল তাহার অর্থ ও রহস্য স্পষ্ট হইবে।

অপর দিকে, পশুরা বিবর্তনের ফলে অগ্রসর হইয়া মানুষকে প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ এখন মানুষ ও পশুতে যে প্রভেদ, সেটা অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে, তাহারা পরস্পরের ভাষা ও ভাব বুঝিতে সক্ষম। এখন একটা পশুকে দেখিয়া মানুষের আর যে ভাবই মনে হোক না কেন, তাহাকে কোন মানুষের বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু তখন অবস্থা এমনি দাঁড়াইয়াছে যে, উঁচকপালী নিরীহ-দংশনকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। তবে এখানেই শেষ নয়, মানুষ সুযোগ পাইলেই পশুর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে উদ্‌গ্রীব, এমন কি, ইহাকে একটা সৌভাগ্য মনে করে, পশুর মনোভাব ঠিক তাহার বিপরীত।

পাঠক, এ সব ইতিহাসের কথা। এ সমস্তর উপরে আমার কোন হাত নাই, যাহা ঘটিয়াছে তাহাই মাত্র বলিতে পারি, আর তাহাই মাত্র বলিতেছি। এখন তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তুমি ঐতিহাসিকের সহিত ঝগড়া করিতে পারো, তবে তাহাতে একটু অন্তরায় আছে। সে ঐতিহাসিক এখনো অজ্ঞাত, কারণ এ ইতিহাস এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। অতএব তর্ক করিবার ইচ্ছা সংবরণ করিয়া যাহা বলিতেছি, চুপ করিয়া শুনিয়া যাও।

৪

দূত-মুখে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সংবাদ শুনিয়া সমস্ত পশুরাজ্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইতিপূর্বে বিবাহের প্রস্তাবে পশুপতি ও পশুসমাজে মতভেদ ঘটিয়াছিল, কিন্তু এখন সাধারণ অপমানের আঘাতে সে ভেদ লোপ পাইল। সকলেই এখন একমত। পশুপতি দরবারগৃহে পশুসমাজকে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখন কর্তব্য কি? জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের কাছে এই অপমান কি আমরা সহ্য করিব, না ইহার প্রতিবিধান করিব?

সকলেই একবাক্যে গর্জিয়া উঠিল,—অবশ্যই প্রতিবিধান করিতে হইবে।

পশুপতি পুনরপি শুধাইলেন,—প্রতিবিধান কি?

সকলে একবাক্যে পুনরপি গর্জিয়া উঠিল—যুদ্ধ!

পশুপতি বলিলেন—তথাস্তু। তোমরা সকলে প্রস্তুত হও।

তখন পশুরাজ্যে মহা উল্লাস পড়িয়া গেল—যুদ্ধ হইবে, মানুষকে সমুচিত দণ্ড দিতে হইবে।

যুদ্ধের আভাসে দুর্বলের যেমন আনন্দ, সবলের তেমন নয়। সেই জন্য পুরুষের চেয়ে মেয়েদের আনন্দ বেশী, আবার মেয়েদের চেয়ে শিশুদের আনন্দ বেশী, আর সব চেয়ে বেশী আনন্দ শয্যাশায়ী অথর্ব রোগীদের। যুদ্ধ আসন্ন—এই সংবাদে 'উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।' মেয়েরা পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—হ্যাঁলা শুনেছিস, আবার যে লড়াই হবে?

—তাই নাকি লা?

—হাঁরে—হাঁ। আমার ভাসুর-পো সিপাই মহলে গাঁজা বেচে, সে নিজে শুনে এসেছে!

—কপালে এত সুখও ছিল! চল্ দিদি, মুগের পুলি করেছি, দুটো খাবি! না, না, তোকে না খাইয়ে ছাড়ছিনে, যে আহ্লাদের সংবাদ দিয়েছিস।

শিশুরা পতাকা লইয়া দল পাকাইয়া রাস্তায় বাহির হইল—হাঁকিতে লাগিল 'দুদ্ধ চাই, দুদ্ধ চাই'।

যদিচ তাহারা এখনো স্পষ্টতঃ যুদ্ধ শব্দটা উচ্চারণ করিতে পারে না, তবু আনন্দ কম হইতে যাইবে কেন?

প্রাপ্তবয়স্কের আনন্দ খুব প্রত্যক্ষ নয়, কেননা তাহাদের যে লড়িতে হইবে এবং হয়তো বা মরিতে হইবে। দুর্বলের সে ভয় না থাকাতে তাহাদের আনন্দ সম্পূর্ণ নিষ্কাম! কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কগণ আনন্দের জন্য না লড়িলেও কর্তব্যের খাতিরে লড়িতে বাধ্য হয়। ঐখানে তাহাদের জিত।

মোট কথা, পশুরাজ্যে আনন্দের ও কর্তব্যের জোড়াকাঠিতে যুদ্ধের জয়ঢাক বাজিয়া উঠিল এবং যথাসময়ে তাহার আওয়াজ ক্ষুদ্রপুচ্ছের রাজধানীতে গিয়া পৌঁছিল।

বিবাহের প্রস্তাবে যাহাদের মত ছিল, তাহারা বলিল, নাও এবার ঠেলা সামলাও, আগেই বলেছিলাম………

ক্ষুদ্রপুচ্ছ বলিল, আমরা যথাশক্তি আক্রমণ প্রতিরোধ করবো।

যথাশক্তি! কিন্তু সামান্য মানুষের কতটুকুই বা শক্তি!

যুদ্ধের সংবাদে ক্ষুদ্রপুচ্ছের রাজ্যে তেমন আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা গেল না, কেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, সামগ্রিক যুদ্ধ প্রগতির লক্ষণ! পশু এখন অধিকতর প্রগত।

৫

যথাসময়ে পশুসমাজের সঙ্গে মানব সমাজের দারুণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। একদিকে হাতীর রেজিমেণ্ট, বাঘের ব্যাটালিয়ন, ভালুকের ডিভিসন, গণ্ডারের কম্পানি, সঙ্গে সাপ, নেউল, ছুঁচো, শিয়াল, কুকুর—সবাই আছে—কেহ বাদ যায় নাই। আর একদিকে মানুষ, সাদা কালো, বেঁটে, মোটা, ঢ্যাঙা, বামন—কত রকম কে বর্ণনা করে। অস্ত্র-শস্ত্র বলিতে উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের হাত, পা, দাঁত, নখ, শিঙ ও ক্ষুর। ওঃ সে কি যুদ্ধ!

ইহাই পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধ! নৃশংসতায় ও বীভৎসতায় ইহা পূর্ববর্তী বিশ্বযুদ্ধের সমকক্ষ না হইলেও নিতান্ত সামান্য ব্যাপার হইল না।

দশ বৎসর অবিরাম যুদ্ধ চলিবার পরে নখ-দন্ত-ক্ষুর-শৃঙ্গে মানুষ দুর্বলতর বলিয়া পশুসমাজের নিকট পরাজিত হইল।

৬

অতঃপর কথা সংক্ষিপ্ত। পরাজিত ক্ষুদ্রপুচ্ছ আপন কন্যার সহিত নিরীহ দংশনের বিবাহ দিতে বাধ্য হইল।

উঁচকপালী ও নিরীহ-দংশন উভয়েই উল্লাসিত হইল, কিন্তু সব চেয়ে বেশী উল্লাস হইল সেই যাহাদের বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি ছিল। তাহারা একবাক্যে বলিল, সেই তো মল খসাতে হল!

একজন বলিল—ভাই. আমরা এখন পশুদের শালা হলাম ! এত সুখও কপালে ছিল !

অপর একজন বলিল,—মনুষ্যত্ব আর ভালো লাগে না, কবে যে পুরো পশু হ'ব !

আর একজন বলিল, আর দেরি নেই, আমার নাতির শিঙ দুটি আকারে বেশ বড় হয়েছে, আমার দুটোর মতো এমন ভোঁতা নয়।

অন্যতম বলিল—উঁচকপালীর ছেলে আমাদের মুখোজ্জ্বল করবে !

সত্যই তাই করিল। উঁচকপালীর ছেলের শিঙ, লেজ, ক্ষুর, লোম, ভাব ও ভাষা অকৃত্রিম পশুর মতো হইল, মানুষের রক্ত-সম্বন্ধের কোন চিহ্নই প্রায় রহিল না।

উঁচকপালী ভাবিল, – আহা, ঠিক পশুর মতোই হ'য়েছে !

নিরীহ-দংশন ভাবিল, – একটুখানি আছে, ওর নাকটা যেন মায়েব মতো !

এই শিশুর নাম হইল মহামানব। যথাকালে সে পিতামহ ও মাতামহ দুজনেরই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া সসাগরা পৃথিবীতে নিঃসপত্ন রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। তাহার শাসনগুণে মানুষ ও পশুর মধ্যে যেটুকু ভেদ ছিল, ঘুচিয়া সব দিব্য একাকার হইয়া গেল। তখন সমস্ত ভেদাভেদ বর্জিত হইয়া পৃথিবী অখণ্ড শান্তি ভোগ করিতে লাগিল। যতদূর জানা গিয়াছে, ইহাই শেষ বিশ্বযুদ্ধ।

# চাচাতুয়া

সৌদামিনী কুসুমকে সঙ্গে করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

কুসুম বলিল—মা, গোরুগুলোর কি হবে?

সৌদামিনী বলিল, ঘাস জল মুখে দিয়ে বাঁধন খুলে দিয়েছি। সঙ্গে তো আর নিয়ে যাওয়া যাবে না।

কুসুম শুধাইল, কোথায় যাবে?

মা বলিল, যেখানে খুশী যাক। বাঁধা থাক্‌লে না খেয়ে মরবে যে।

তারপরে বলিল—নে, নে, তাড়াতাড়ি চল্‌। ভোর হবার আগে গাঁয়ের বাইরে যেতে হবে, নইলে কে আবার কোথা থেকে দেখতে পাবে।

কুসুম বলিল, একটু দাঁড়াও। এই বলিয়া ছুটিয়া সে ঘরের ভিতরে গেল এবং একটি খাঁচা লইয়া বাহিরে আসিল।

মা বলিল, ওকি, ওকে আবার সঙ্গে নিবি নাকি?

কুসুমের তাই ইচ্ছা বটে।

মা বলিল, পাগল নাকি? নিজেরা চলতে পারলে হয়, আবার একটা পাখী! দে, দে, খাঁচা খুলে ছেড়ে দে, বনের পাখী বনে চলে যাক্‌!

কুসুমের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, কিন্তু নিরুপায়। তখন সে খাঁচার দরজা খুলিয়া দিল।

কিন্তু পাখীটা বাহির হইবার কোন উদ্যম করিল না, সে গম্ভীরভাবে বসিয়াই রহিল। তখন কুসুম পাখীটাকে ধরিয়া বাহিরে আনিল, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল, অমনি সে গলা ফুলাইয়া বলিয়া উঠিল—

'রাধাকৃষ্ণ বলোরে ভাই
তার চেয়ে আর বড় নাই।"

পাখীটি একটি কাকাতুয়া। কুসুমের কাকা কলিকাতা হইতে পাখীটি আনিয়া কুসুমকে দিয়াছিল। কাকাতুয়া সাধারণতঃ দেখা যায় না, তারপরে সেটা আবার সুন্দর কথা বলিতে শিখিয়াছিল, কুসুম তাহাকে অত্যন্ত আদরে পালন করিয়াছিল, কখনো ভাবে নাই যে তাহাকে নিজ হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে—আজ তাই হইল।

সে কাকাতুয়াটির নাম রাখিয়াছিল বোষ্টমদাস। বোষ্টমদাস ছাড়া পাইয়াও উড়িল না, তখন কুসুম তাহাকে আকাশে উড়াইয়া দিল, সে নিম গাছের উপরে গিয়া বসিয়া আবার বলিল --

"রাধাকৃষ্ণ বলোরে ভাই
তার চেয়ে আর বড় নাই।"

লোকে পাখীকে 'রাধাকৃষ্ণ" নাম শেখায়। কুসুম তাহার আদরের পাখীকে উক্ত ছড়াটি শিখাইয়াছিল। সে উক্ত ছড়াটি বলিয়া দর্শকদের বিস্মিত করিয়া দিত, সকলে বলিত ঠিক যেন মানুষের স্বর। ওটা ঠিক নয়, বলা উচিত যে ঠিক যেন বেতারে নারীকণ্ঠ। তেমনি যান্ত্রিক, তেমনি প্রাণহীন, তেমনি তীক্ষ্ণ মধুর! তবু তো পাখীর গলায় মানুষের স্বর, লোকে অবাক্ হইয়া শুনিত।

মা ও মেয়ে অগ্রসর হইয়া চলিল, পাখীটা কিছু দূর অবধি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরে উড়িয়া উড়িয়া চলিল, তারপরে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া গেল। সে কেমন করিয়া বুঝিবে যে তাহার আশ্রয়দাতাগণ চিরদিনের মতো নিজেদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। কুসুম অনেকক্ষণ অবধি শুনিতে পাইল, বোধ করি কল্পনাতেই শুনিতে পাইল যে, বোষ্টমদাস যেন বলিতেছে—

"রাধাকৃষ্ণ বলোরে ভাই
তার চেয়ে আর বড় নাই।"

প্রকৃতিতে কোথাও শূন্যতা থাকে না, কোথাও কোন কারণে একটা ফাঁক হইবামাত্র নূতন বস্তু আসিয়া সেই গহ্বর পূর্ণ করিয়া তোলে। সেই নিয়মের বলেই সন্ধ্যাবেলা সৌদামিনীর শূন্য গৃহে নৈমুদ্দি তাহার জরু, গরু, বদনা, কাঁথা ও পুত্র গফুরকে লইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙিবামাত্র নৈমুদ্দি শুনিতে পাইল কে যেন বলিতেছে—

"রাধাকৃষ্ণ বলোরে ভাই
তার চেয়ে আর বড নাই।"

নৈমুদ্দি 'আল্লা আল্লা' রবে চাৎকাব কবিয়া উঠিল, বলিল, গফুব, দেখ তো কোন্ দুষমণে চিল্লায!

নৈমুদ্দি বিশুদ্ধ বাঙালা, স্থানীয় বাংলা ভাষাতেই সে অভ্যস্ত, কিন্তু অধুনা যুগ-মাহাত্ম্যে সে শতকবা দশটা আববী শব্দ ব্যবহাব করিয়া থাকে। তাহার বিশ্বাস 'চিল্লায়' শব্দটা বিশুদ্ধ আববী।

গফুর ঘরের বাহিবে গিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিল--বা'জান, কিছু তো দেখতে না পাই।

নৈমুদ্দি গর্জ্জন করিয়া বলিল - 'নিরিখ' না হয়।

নৈমুদ্দি নিজে আরবী বলিয়াই সন্তুষ্ট নয়, পুত্রকেও আরবী ভাষা শিক্ষা দিয়া থাকে।

তখন নিজে সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—বলিল--দুষমণ কই রে?

কিন্তু কোথায় দুষমণ! দুষমণ যে-ই হোক এবং যেখানেই সে অবস্থান করুক,

"রাধাকৃষ্ণ বলোরে ভাই
তার চেয়ে আর বড় নাই।"

ছড়াটি ক্রমাগত ধ্বনিত হইয়া নৈমুদ্দির কর্ণে গরল ঢালিয়া দিতে লাগিল।

তখন নৈমুদ্দি, গফুর ও অন্যান্য সবাই দুষমণের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। বাড়ীর মধ্যে সে নাই, কিন্তু নিকটেই কোথাও আছে! তবে কি গাছের উপরে? তবে তো আর ভুল নাই যে দুষমণ।

কি সর্ব্বনাশ!

গফুরের মা বলিল, তখনি বলেছিলাম যে হিন্দুর বাড়ীতে ঢুকে কাজ নাই। সে মনে মনে স্থির করিল যত সত্বর সম্ভব দরগায় একটা শিন্নি পাঠাইয়া দিতে হইবে আর নৈমুদ্দি সিদ্ধান্ত করিল লীগ অফিসে একবার সংবাদ দেওয়া উচিত।

গফুর বালক, সে লীগ অফিস ও দরগার রহস্য সম্বন্ধে এখনো ওয়াকিবহাল নয়—তাই সে গাছপালার মধ্যে খোঁজ করিতে লাগিল এবং হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল—বা'জান দেখ্যা যাও, একটা মজার পাখী!

বাপজান প্রত্যুত্তরে গর্জ্জন করিল—হারামজাদা, বল 'মজাদার চিড়িয়া!'

গফুর বলিল, হাঁ হাঁ, তাই, তুমি শীগ্‌গীর দেখ্যা যাও।

নৈমুদ্দি পুত্রের কাছে ছুটিয়া উপস্থিত হইল এবং আম গাছের ডালে উপবিষ্ট প্রকাণ্ড একটা শাদা রঙের পাখী দেখিতে পাইল, আবার পরক্ষণেই শুনিল উক্ত বিহঙ্গের কণ্ঠ হইতেই ধ্বনিত হইতেছে:

'রাধাকৃষ্ণ বলোরে ভাই
তার চেয়ে আর বড় নাই।"

ভয়ে বিস্ময়ে নৈমুদ্দি মাটির উপরে বসিয়া পড়িয়া কপাল চাপ্‌ড়াইয়া বলিয়া উঠিল, হা আল্লা, এ কোন ত্যাশে আনলা।

গফুর বলিল, বা'জান ত্যাশ নয়, মুল্লুক।

নৈমুদ্দি গর্জ্জন করিল, চুপ কর্ শালা!

নৈমুদ্দির মুখে তখন বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ বাহির হইতে লাগিল—ইহাতেই তাহার ভয় ও বিস্ময়ের পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইবে।

সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, আমিনারে, এবারে বুঝি সবাই গেলাম ! নতুন গুড়ের পায়স আর কে খাইব রে !

আমিনা অর্থাৎ গফুরের মা ছুটিয়া আসিয়া পাখীটাকে ও স্বীয় স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বলিল আরে কাঁদো কেন, ওটা পাখী !

নৈমুদ্দি বলিল -তবে ও কি বলে ?

আমিনা বলিল—কোন হিন্দুঁর বাড়ীতে ছিল, ঐ কথা শিখেছে।

নৈমুদ্দি অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—তাই বল্।

গফুর বলিল হাঁ বা'জান ওটা পাখী, দুষমন নয়, পাখী।

নৈমুদ্দি ফোঁস করিয়া উঠিল বলিল, বল্—চিড়িয়া !

তাহার মুখে বিশুদ্ধ আরবী শব্দ নির্গত হওয়াতে সবাই আশ্বস্ত হইল বুঝিল, আশু ভয়ের কারণ নাই।

নৈমুদ্দি শুধাইল—ওটা কি চিড়িয়া ?

ইতিমধ্যে আরও দুই চারজন জ্ঞানী ব্যক্তি আসিয়া জুটিয়াছে, কিন্তু পক্ষীতত্ব সম্বন্ধে সকলেরই জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়াতে কেহই পাখীর প্রকৃত পরিচয় দিতে সমর্থ হইল না। জ্ঞান সীমাবদ্ধ না হইলে গবেষণার সূত্রপাত হয়না, এবারে গবেষণা আরম্ভ হইল।

কেহ বলিল - ওটা চিলা পাখী ( চিলা অর্থাৎ চিলের আরবী ) চূণ মাখছে।

কেহ বলিল বিলাতী রামপাখী। ( বিলাতের মানুষ যখন শাদা, বিলাতের মুর্গীই বা শাদা না হইবে কেন ? )

কেহ বলিল—ওটা কোন বড় মানুষের বাড়ীর বুলবুলি, অনেক খাইয়া মোটা হইয়াছে।

নৈমুদ্দির কোন সিদ্ধান্তেই আপত্তি নাই, আপত্তি পাখীটার ঐ কাফেরী ছড়ায় !

নৈমুদ্দি বলিল ওটাকে ধরিয়া খুন করিবে।

গফুর বলিল—বাড়ীতে একটা খাঁচা দেখিয়াছি, ওটাকে ধরিয়া পুষিব।

নৈমুদ্দি বলিল, ঐ চিড়িয়া বাড়ীতে রাখলে তোকে খুন করব।

আমিনা জানাইল যে কাহাকেও খুন করিতে হইবে না। উহাকে যেমন শিখাইবে তেমনি শিখিবে। হিন্দুঁরা হিন্দুঁর দেবতার নাম শিখাইয়াছে, তুমি ধরিয়া ওকে পীর পয়গম্বরের নাম শেখাও না কেন?

সকলে আমিনার জ্ঞানে তাজ্জব বনিয়া গেল। নৈমুদ্দি বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—আমিনা, তুই ফরী ( পরী )।

তখন পাখী ধরিবার শলা পরামর্শ আরম্ভ হইল।

কেহ বলিল- ফাঁদ পাতি।

কেহ বলিল,- গাছে উঠি।

কেহ বলিল—ঢিল মারি।

নৈমুদ্দি বলিল,—ফরিদ মিঞার বন্দুকটা আনিয়া একটা আওয়াজ করি।

আমিনা বলিল,— তবেই হইয়াছে, একটা পাখী ধরিবে তার এত জটলা।

এই বলিয়া খাঁচাটা আনিয়া গাছ তলায় রাখিল। পরিচিত আশ্রয় দেখিবামাত্র কাকাতুয়াটি বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া ভালো ছেলেটির মতো খাঁচায় প্রবেশ করিল, আমিনা সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অমনি সকলে সমস্বরে জিগীর করিয়া উঠিল, আল্লা হো আকবর।

কিন্তু রস ভঙ্গ করিল কাকাতুয়া নিজে—সে বলিয়া উঠিল—

"রাধাকৃষ্ণ বলোরে ভাই
তার চেয়ে আর বড় নাই।"

'আজ শালাকে খুন না ক'রে পানি খাবো না'—বলিয়া একখানা লাঠি তুলিয়া লইয়া নৈমুদ্দি খাঁচার দিকে ছুটিল, কিন্তু খাঁচা পর্য্যন্ত পৌঁছিবার আগেই একখানা ইঁটে হুচোট খাইয়া পড়িয়া গেল উঠিবামাত্র গফুরের দিকে চোখ পড়িল, শুধাইল, হাসচিস যে—

সত্য কথা বলিতে কি গফুর হাসে নাই, তবে পরমারাধ্য বাপজানকে

অকস্মাৎ ভূপতিত হইতে দেখিয়া যে পরিমাণ দুঃখিত হওয়া উচিত তাহাও হয় নাই।

গফুর বলিল—হাস দিব কেন?

—আবার কেন? বলিয়া নৈমুদ্দি এবার তাহার দিকে ছুটিল। গফুর একখানা থান ইঁট কুড়াইয়া লইয়া পরমপূজ্যের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। আমিনা দেখিল সমূহ বিপদ। আজ ঐ একটা কাফেরী পাখীর জন্য তাহাকে হয় পতি, নয় পুত্র, কিম্বা দুজনকেই হারাইতে হইবে দেখিতেছি। সে উভয়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—নাও অনেক হয়েছে, একটা পাখীর জন্যে ছেলেকে মারধোর!

সে বলিল—একটা ছড়া বেঁধে দাও, আমি পাখীটাকে শিখিয়ে দিচ্ছি।

নৈমুদ্দি বলিল, সেই বাৎ আচ্ছা।

নৈমুদ্দির আরবী জ্ঞান সরকারী পুলিশের মতো, বিপদকালে দেখা দেয় না, সম্পদকালে আসিয়া হাজির হয়।

নৈমুদ্দি বলিল—ইয়াসিন, একটা বয়েৎ তৈরী করে দাও।

ইয়াসিন একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। ক্লাস সেভেনে পড়িবার সময়ে রামপাখী ও রাম-রাজত্বের উপরে তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া একটি প্রাইজ পাইয়াছিল।

সে বলিল—কাল ফজর বেলা দিয়ে যাবো।

তখন সকলে নিজ নিজ বাড়ীতে প্রস্থান করিল।

ইয়াসিন সারা রাত্রি জাগিয়া, দেড় সের তামাকু, দেড় পোয়া গাঁজা, পাঁচ ডজন বিড়ি নিঃশেষ করিয়া, বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের চড়-চাপড়ে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া প্রার্থিত বয়েৎটি রচনা করিয়া ফেলিল—এবং ফজর হইবামাত্র তাহা নৈমুদ্দিকে শোনাইয়া দিয়া গেল। ইয়াসিন রচনা করিয়াছে—

"আল্লাতাল্লা বলো মিঞা
বেহস্ত যাবে বুঁচকি নিয়া।"

কাহার বুঁচকি লইয়া কে বেহস্ত যাইবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকায়

একটু অসুবিধা ঘটিলেও মোটের উপরে সকলেরই বয়েৎটি বড় মনোরম লাগিল—তাহা ছাড়া বেহ্স্ত গমনের যে পন্থাটির উল্লেখ আছে তাহাও তেমন দুর্গম নয়।

পাখীটাকে নূতন বয়েৎ শিখাইবার ভার আমিনার উপরে অর্পিত হইল।

আজ তিন চারদিন হইল আমিনা পাখীটাকে বয়েৎ শিক্ষা দিতেছে, তাহার সহকারী গফুর। ইতিমধ্যেই সে আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছে। আমিনার টেকনিক নূতন না হইলেও ফলপ্রদ। খাদ্যের পরিমাণ কম বেশি করিয়া, কখনো বা একেবারে বন্ধ করিয়া, কখনো বা দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে খাদ্যের পাত্র সরাইয়া লইয়া, কখনো বা পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে মুখের কাছে আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে—

"আল্লাতাল্লা বলো মিঞা
বেহ্স্ত যাবে বুঁচকি নিয়া।"

পাখীটা হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে, লীগপন্থী বা কংগ্রেসী কিছুই নহে, এক কথায় পাখীত্ব ছাড়া তাহার কোন প্রিন্সিপল নাই, কাজেই সে ধীরে ধীরে পুরানো শ্লোক ভুলিতে ও নূতন বয়েৎ শিখিতে সুরু করিল।

নৈমুদ্দি আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল—কতদূর কি 'শরিফ' হইল?

আমিনা পাখীটার মুখের কাছে খাদ্যের পাত্র লইয়া আসিল, গফুর করুণ নেত্রে তাকাইয়া আদেশ করিল, বলো তো মিঞা—

পাখী বলিল—

'রাধাকৃষ্ণ বলোরে ভাই'

নৈমুদ্দি গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

আমিনা খাদ্যের বাটী সরাইয়া লইল।

গফুর 'কি করলি মিঞা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—

পাখী পুরাতন ছত্রের বদলে নূতন ছত্র বলিল—

'বেহ্স্ত যাবে বুঁচকি নিয়া।'

নৈমুদ্দি খুশী হইয়া বলিল—

কেয়াবাৎ।

আমিনা খাদ্যের বাটী মুখের কাছে টানিয়া আনিল।

গফুর পাখীর কৃতিত্ব নিজে আত্মসাৎ করিয়া বলিল—বা'জান, এবার ইদের পরবে একটা নয়া ফেজ খরিদ করে দিও।

নৈমুদ্দির 'না' বলিবার পথ বন্ধ, চিড়িয়া ও লেড়কা দুজনেই আরবী শব্দ ব্যবহার করিতেছে, কাজেই সে বলিল, বহুৎ আচ্ছা লেড়কা।

আরও তিন চার দিন পরে পাখীটা নূতন বয়েৎ আগাগোড়া বলিতে শিখিল। আমিনার ইঙ্গিতে সে বলিত—

"আল্লাতাল্লা বলো মিঞা
বেহ্স্ত যাবে বুঁচকি নিয়া।"

নৈমুদ্দি বলিল—খোদার মর্জ্জি।

মনে মনে ভাবিল—হবে না কেন, যে রাজ্যের যে নিয়ম।

কিন্তু মুখে এতখানি বলিবার শক্তি নাই, আরবি শব্দের টানাটানি। এই কারণেই আজকাল প্রায়ই তাহার মুখের ভাষায় ও মনের ভাবনায় মেলে না, ফারাক থাকিয়া যায়।

পাঠক, তুমি হয় তো ভাবিতেছ যে পাখীটার এ কি পরিবর্ত্তন। কিছুই পরিবর্ত্তন নয়। এমন অবস্থাতে পতিত হইলে অনেক মানুষেও মত বদলায়, বদলাইতেছে এবং চিরকাল বদলাইতে থাকিবে, ও তো সামান্য বিহঙ্গমাত্র। ধর্ম্ম বলো, ভাষা বলো, মনুষ্যত্ব বলো—সকলেরই প্রকৃত স্থান খাদ্যের পাত্র।

নৈমুদ্দি পাড়া পড়শীকে ডাকিয়া চিড়িয়ার মুখে আরবী বয়েৎ শোনাইয়া দিল, শুনিয়া সকলে বলিল—তাজ্জব।

একজন বলিল, তমিজ মোল্লাকে শোনাইয়া দাও।

তমিজ মোল্লার বাড়ী নোয়াখালি জেলায়। সে মাঝে মাঝে জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় লোকের চক্ষুরুন্মীলন করিবার উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে আসিয়া থাকে।

তমিজ মোল্লাকে দেখিয়া পাখী বলিল—

"আল্লাতাল্লা বলো মিঞা
বেহস্ত যাবে বুঁচকি নিয়া।"

বয়েৎ শুনিয়া তমিজ মোল্লা বলিয়া উঠিল, খোদার কুদরৎ। এমন চিড়িয়া সে জীবনে আর দেখে নাই।

সে আরও বলিল যে পাখীর বাৎ সাচ্চা! বিশেষ তমিজ মোল্লার পক্ষে তাহা ষোল আনা প্রযোজ্য, কারণ কেবল আল্লা বলিবার জোরেই সে বেহস্ত যাইবে—আর তাহার সঙ্গে এত বোঁচকা বুঁচকি হইবে যে সেসব বহন করিবার নিমিত্ত ইস্রাইলকে নূতন ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

সকলেই তমিজ মোল্লার উক্তির সারবত্তা স্বীকার করিল।

তখন সকলে বহুদর্শী তমিজকে শুধাইল, মোল্লা, পাখীটার নাম কি?

তমিজ বলিল, পাখীর নাম জিজ্ঞাসা করতে হদিসে নিষেধ আছে।

এমন সময়ে ছকন মিঞা আসিয়া উপস্থিত হইল, সে কলিকাতায় থাকে, সম্প্রতি গ্রামে আসিয়াছে। সে পাখীটাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—আরে এ যে কাকাতুয়া!

তমিজ মোল্লা বলিল, আমিও জানতাম তবে কিনা হদিসের নিষেধ তাই বলি নাই—কিন্তু নৈমুদ্দি মিঞা, এ চিড়িয়া তো বাড়ীতে রাখলে 'গুণা' হবে।

সবাই শুধাইল, কেন, কেন?

তমিজ বলিল—কাকাতুয়া যে হিন্দু নাম।

গফুর বলিল—হোক গুণা, আমি পাখী ছাড়ব না।

আমিনা বলিল—এত কষ্টে শেখালাম।

নৈমুদ্দি বলিল—কি মুস্কিল!

এমন সময় ছকন মিঞা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মুস্কিল আসান করিয়া দিল, বলিল—

এ আর মুস্কিল কি! কাকাতুয়া যদি হিন্দু নাম হয, ওকে 'চাচাতুয়া' ক'রে নাও, তাহলেই হবে।

এক কথায় মুস্কিল আসান হইয়া গেল—সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,

চাচাতুয়া!

পাখীটা এ যাত্রা নৈমুদ্দির বাড়ীতে থাকিয়া গেল।

আমিনা বলিল—ছকন রে, তুই আর জন্মে আমার 'ছাওয়াল' ছিলি।

গফুর একটা পাকা পেয়ারা আনিয়া তাহাব হাতে গুঁজিয়া দিল।

নৈমুদ্দি সকলের দিকে তাকাইয়া বলিল—এলেমদাব ছেলে বটে।

তমিজ মোল্লা কিন্তু খুশী হইল না, কাকাতুযাটিকে হস্তগত করিতে পারিলে নযানপুরের হাটে উচ্চমূল্যে বেচিতে পারিত। অতএব সে অপ্রসন্নমুখে বিদায় লইল।

কাকাতুয়াটি 'চাচাতুযা' নামে নৈমুদ্দি-ভবনে খাঁচায দুলিতে দুলিতে বিশুদ্ধ আরবী বয়েদ্ আবৃত্তি করিযা সকলকে তাজ্জব করিয়া দিত—

"আল্লাতাল্লা বলো মিঞা
বেহস্ত যাবে বুঁচকি নিয়া।"

আর গফুর খাঁচার কাছে ঘুরিয়া ঘুবিযা লাফাইত, আর আপন মনেই চীৎকার করিয়া বলিত, 'চাচাতুয়া রে চাচাতুয়া!'

# জেনুইন লুনাটিক্

যুদ্ধান্তে ভানুপ্রকাশ বেকার হইয়া রোজগারের পন্থা খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু দু'চার দিন পরেই বুঝিতে পারিল কাজটি সহজ নয়। যুদ্ধকালে সে মানুষ-মারা শিখিয়াছিল, মানুষ মারিতে উৎসাহ পাইয়াছিল—এখন নাগরিক জীবনে সে পন্থা অনুসরণ করিতে গিয়া দেখিল আইন অলঙ্ঘ্য বাধা—এবং সেই পথের শেষ সীমায় দুরারোহ ফাঁসিকাষ্ঠ দণ্ডায়মান। তখন সে কিছুকাল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল।

কিছুদিন পরে অপ্রত্যাশিতরূপে ভাগ্য তাহার প্রতি সদয় হইল। সে শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে দাঁড়াইয়াছিল—এমন সময়ে ঠিক তাহার সম্মুখেই এক ভদ্রলোক অনবধানবশতঃ একখানি দ্রুতগামী মোটরের সম্মুখে গিয়া পড়িল—আর একটু হইলেই চাপা পড়িত! ভানুপ্রকাশ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ভদ্রলোকটিকে টানিয়া সরাইয়া দিল। ভদ্রলোকটি বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া রক্ষাকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল—তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিল, কিছুতেই ছাড়িল না।

ভদ্রলোকটি শুধাইল—আমি আপনার কি করতে পারি? আপনি তো আমাকে প্রাণে বাঁচালেন!

ভানুপ্রকাশ বাড়ীর দরজায় ভদ্রলোকের নাম, ডাক্তারি ডিগ্রি ও বিবরণ

দেখিয়া বুঝিয়াছিল—ভদ্রলোকটি একজন উচ্চ উপাধিধারী পাগলের ডাক্তার।

ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া তাহার মস্তিষ্কে প্রতিভার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে বলিল—আমার উপকার যদি করতে চান—তবে আমাকে একখানি পাগলামির সার্টিফিকেট দিন।

ডাক্তার বলিলেন—সে কি! আপনি তো দিব্য সুস্থ!

ভানুপ্রকাশ বলিল—এখন সুস্থ বটে! কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক দিনের জন্য মাথা খারাপ হয়ে যায়—তখন আমি বদ্ধ উন্মাদ।

তারপরে বলিল—আপনার সার্টিফিকেট পেলে আমার পক্ষে কোন পাগলা-গারদে গিয়ে ভর্তি হওয়া সহজ হবে। পয়সা খরচ ক'রে সার্টিফিকেট নেওয়ার সাধ্য আমার নেই।

ডাক্তার তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সার্টিফিকেট লিখিতে বসিলেন। ভানুপ্রকাশ বলিল—আপনি লিখে দেবেন, পাগল অবস্থায় আমি violent হ'য়ে উঠি, অন্য সময় আমি বেশ non-violent।

ডাক্তার তাহার বর্ণনা অনুসারে সে যে একজন 'জেন্টুইন লুনাটিক' এবং 'ভায়োলেণ্ট লুনাটিক'—এইরূপ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন। ভানুপ্রকাশ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরিচয়পত্রখানি পকেটে লইয়া প্রস্থান করিল।

ভানুপ্রকাশ কিছুকাল পথচারণা করিয়া বুঝিয়াছে যে, সংসারে ধনীর স্থান আছে, মানীর স্থান আছে, দরিদ্রের স্থান আছে, উন্মাদের স্থান আছে কিন্তু সাধারণের স্থান নাই। ভানুপ্রকাশ নিতান্তই সাধারণ—এমনকি তাহার দারিদ্র্যও অসাধারণ নয়। এখন সে পাগলের ছাড়পত্র পাইয়াছে, এবার সংসারের পথ অনেকটা সুগম হইবে বলিয়া তাহার মনে হইল। ছাড়পত্রের বলে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার পূর্বে সে একটি সৌখিন ভোজনাগারে গিয়া বসিল। অনেকদিন পরে সে পেট ভরিয়া সুখাদ্য খাইল। আহারান্তে খানসামা বিল আনিলে বিলখানি হাতে লইয়া

মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল, আর লবণদানি হইতে খানিকটা লবণ মুখে দিয়া চিবাইতে সুরু করিল।

খানসামা বিস্মিত হইল, ব্যাপার কি ?

ভানুপ্রকাশ খানসামার দিকে অধিকতর বিস্ময়ে তাকাইয়া বলিল, খানিকটা sauce নিয়ে এসো।

বিল খাইবার এমন উপকরণের প্রস্তাবনা খানসামাটি ইতিপূর্বে আর শোনে নাই। সে ছুটিয়া ম্যানেজারের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, একঠো পাগলা আদমি আয়া হ্যায়।

এবারে খানসামা সমভিব্যাহারে ম্যানেজার আসিয়া উপস্থিত হইল। ভানুপ্রকাশ তখন চর্বিত বিলটিকে মাটিতে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের দেখিয়া চর্বিতচর্বণ সুরু করিল। বেগতিক দেখিলে অনেকেই উক্ত কাজটি করিয়া থাকে।

ভানুপ্রকাশ ইংরাজিভাষায় ম্যানেজারকে বলিল, তোমাদের শেষের খাদ্যটি তেমন রুচিকর নয়, আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হয়েছি।

ম্যানেজার বলিল—ওটা বিল।

ভানুপ্রকাশ বলিল যে নামই দাওনা কেন, ভোজনাগারে ভোজ্য ছাড়া আর কি পাওয়া যায় ?

ইতিমধ্যে সে কৌশলে পকেট হইতে ডাক্তারের সার্টিফিকেটখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া ম্যানেজারকে সেখানা তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিল।

ম্যানেজার কাগজখানা তুলিয়া তাহার হাতে দিবার অবকাশের মধ্যে এক নজর সেখানা পড়িয়া লইল।

সর্বনাশ ! ভায়োলেণ্ট লুনাটিক !

ম্যানেজার সবিনয়ে জানাইল, আপনি যেতে পারেন, মূল্য দিতে হবে না।

ভানুপ্রকাশ উঠিয়া ম্যানেজারকে একটা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ম্যানেজার ভাবিল, খুব প্রাণে বেঁচে গেলাম! কারণ চোর, বদমাস, চোরা-কারবারী, হঠাৎ-ধনী, হঠাৎ-গরীব নানারকম লোকের হাতে নিত্যই সে পড়িয়া থাকে কিন্তু ইতিপূর্বে আর কখনো ভায়োলেন্ট লুনাটিকের হাতে সে পড়ে নাই

ভানুপ্রকাশ বাহিরে আসিয়া একটু নির্জন স্থান সন্ধান করিতে লাগিল।

আমরা বলিব ভানুপ্রকাশের নমস্কার করা উচিত হয় নাই—ওটা লুনাটিকের লক্ষণ নয়। যাহাই হউক কালক্রমে সব সংশোধন হইয়া যাইবে —ইহা তাহার শিক্ষানবিশীর প্রথম ধাপ বইতো নয়।

ভানুপ্রকাশ কিন্তু অন্য কথা ভাবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে কেবল প্রথম রাউণ্ডে সে বিজয়ী হইয়াছে, চরম বিজয়ের এখনো অনেক বাকি। জীবন-সংগ্রামের পরিকল্পনা প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে সে কার্জন পার্কের একান্তে গিয়া বসিল।

ভানুপ্রকাশ দু'চার দিনেই বুঝিতে পারিল যে, একটা আস্ত প্রকৃতিস্থ মানুষের পক্ষে জেন্থইন লুনাটিকের নিখুঁৎ অভিনয় করা সহজ ব্যাপার নয়, এমনকি বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকিলেও নয়। অনেক জায়গাতেই পাগলের অভিনয় করিতে গিয়া সে সন্দেহ উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। সংসারে পাগল দুই শ্রেণীর। বদ্ধোন্মাদ আর মুক্তোন্মাদ। যাহাদের পাগলা-গারদে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় তাহাদের বদ্ধোন্মাদ বলে; তাহাদের সংখ্যা কম। আর যে-সব পাগল সাধারণ মানুষের মতো পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা মুক্তোন্মাদ। তাহাদের জন্য পাগলা-গারদ নাই—খুব সম্ভব তত বড় পাগলা-গারদ তৈরি করা সম্ভব নয়। এখন ভানুপ্রকাশ বুঝিতে পারিল যে তাহাকে মুক্তোন্মাদ শ্রেণীতে পড়িলে চলিবে না, তাহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না; বদ্ধোন্মাদ শ্রেণীতে ভর্তি হইতে হইবে. তবেই তাহার সমস্যা সমাধান হইবার সম্ভাবনা।

তখন ভানুপ্রকাশ বুঝিল যে তাহাকে 'বদ্ধোন্মাদের আচার-ব্যবহার

শিখিতে হইবে। কিন্তু তাহার উপায় কি? অবশ্য বই পড়িয়া শেখা যায় কিন্তু প্রকৃত উপায় হইতেছে সরেজমিনে অর্থাৎ খাঁটি বদ্ধোন্মাদের নিকট হইতে পাঠ লওয়া। ভানুপ্রকাশ স্থির করিল তাহাই করিবে এবং সেই উদ্দেশ্যে বদ্ধোন্মাদগণের দিব্যধাম রাঁচির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

গাড়ীতে উঠিয়া সে এক বিপদে পড়িল। সকলেই জানেন যে এক শ্রেণীর কর্মচারী আছে যাহারা যাত্রীদের টিকিট দেখিতে চায়। যাত্রীদের হায়রানি করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। সেই রকম এক কর্মচারী আসিয়া ভানুর টিকিট দেখিতে চাহিল। বলাবাহুল্য ভানুপ্রকাশের টিকিট ছিল না, টিকিটই যদি কিনিবে তবে আর সে বদ্ধোন্মাদ কেন, তবে মুক্তোন্মাদের সংগে তাহার প্রভেদটা কি? ভানু টিকিটের পরিবর্তে ডাক্তারী সার্টিফিকেটখানি বাহির করিয়া দিল। টিকিট চেকার সেখানা ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল, টিকিট কোথায়? ভানু পকেট খুঁজিয়া একখানা পুরাতন ডাকটিকিট বাহির করিয়া দিল।

চেকার বলিল—ওসব চালাকি রাখুন, টিকিট দিন, নতুবা হাজতে চলুন।

ভানু বলিল—তাইতো যাচ্ছি।

চেকার শুধাইল—কোথায়?

ভানু বলিল—রাঁচিতে।

—কেন?

—কেন কি? দেখছেন না আমি উন্মাদ।

—কোন লক্ষণ তো দেখছি না।

ভানু বুঝিল তাহার কথাবার্তা অত্যন্ত বেশি মুক্তোন্মাদের মতো হইতেছে, এমন আর কিছুক্ষণ চলিলে তাহার কেস্ নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই সে বলিল—লক্ষণ দেখাচ্ছি।

এই বলিয়া সে মাথা নীচু দিকে দিয়া পা দু'খানা উঁচুতে সোজা করিয়া খাড়া করিল। সে শুনিয়াছিল প্রকৃত পাগলেরা মাঝে মাঝে এমন করিয়া

থাকে। কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ পা দু'খানা সোজা খাড়া না হইয়া কিঞ্চিৎ বাঁকিয়া গেল।

তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া অন্য যাত্রীরা বলিয়া উঠিল—লোকটা পাগল নাকি ?

এমন আশার কথা ভানুর কানে আর কখনো প্রবেশ করে নাই—সে চেকারের উদ্দেশ্যে বলিল—শুনছেন তো ? লোকে কি বলছে ? জনগণের সিদ্ধান্তই এ যুগের বেদবাক্য—অতএব আপনি সরে পড়ুন।

অভাবিত হাঙ্গামায় পড়িতে হয় দেখিয়া চেকার সরিয়া পড়িল। ভানুপ্রকাশ আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে যাত্রীরা বুঝিল লোকটা পাগল। তাহারা সরিয়া গেল। অনেকটা জায়গা পাইয়া ভানুপ্রকাশ টান হইয়া শুইয়া পড়িল, এবং পাগলরা যে ঘুমায় না সে কথা ভুলিয়া গিয়া অল্পক্ষণেই ঘুমাইয়া পড়িল।

তারপরে সে যথাসময়ে ও যথাশাস্ত্র রাঁচিতে পৌঁছিল। পথে আর কোন বিঘ্ন ঘটে নাই।

রাঁচিতে উপস্থিত হইয়া দর্শকরূপে সে পাগলা-গারদ দেখিতে গেল। সে দেখিল সারি সারি বদ্ধ ঘরে বদ্ধোন্মাদের দল বিরাজ করিতেছে। হঠাৎ দেখিলে মুক্তোন্মাদের সঙ্গে তাহাদের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। ভানু আরও দেখিল যে নিয়মিত সময়ে পাগলেরা প্রচুর আহার্য পাইতেছে। সে ভাবিল—আহা, ইহারা দিব্য আরামে আছে। তাহার মনে হইল—আচ্ছা, সুখ যদি থাকে তবে এখনো এইখানে আছে—এই বদ্ধোন্মাদ-ধামে। সে স্থির করিল—যেমন করিয়াই হোক এখানে ভর্তি হইতে হইবে। পৃথিবীতে নদনদী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া অবসিত হয় তেমনি সংসারের সব সমস্যার সমাধান এই পাগলা-গারদে।

তারপরে সে একটা পাগলকে বলিল—এই, বাইরে আসবি ?

সে বলিল—দরজা খুলে দে না।

ভানু তাহার দরজা খুলিয়া দিতেই লোকটা বেগে প্রস্থান করিল, আর ভানু ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইল।

যথাসময়ে পাচক তাহার খাদ্য দিয়া গেল, ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেল। ভানু খাদ্য খাইল, ঔষধটা ফেলিয়া দিল এবং তারপরে নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া পড়িল। আহা, ভানু এখন সাংসারিক চিন্তার মোক্ষধামে উপনীত!

মাঝে মাঝে তাহার দরজার সম্মুখে দর্শক আসে, ভানু বলে, আপনারা ভাবছেন আমি পাগল, মোটেই তা নয়! এখানে দিব্য আরামে আছি, আপনারাও আসুন না!

কোন দর্শক বলে, লোকটা আস্ত পাগল।

কোন দর্শক বলে, পাগলে নিজেকে কখনো পাগল বলে না।

কোন দর্শক শুধায়, তোমার নাম কি?

—ভানুপ্রকাশ।

দর্শক বলে—ঐ দেখুন. দরজায় লেখা আছে রামতারণ!

রামতারণ লেখাই আছে বটে—আগে যে ছিল তাহার নাম।

ভানু ক্রমে বুঝিতে পারিল পাগলের খাঁচাও নিরঙ্কুশ সুখকর নয়, কেননা এখানে চা পাওয়া যায় না, এবং সিগারেট পাওয়া যায় না, এবং সর্বোপরি খবরের কাগজ পাওয়া যায় না। ভানু ভাবিল, হায়, স্বর্গেও দুঃখ আছে। কেবল অনভিজ্ঞ মানুষ দূর হইতেই স্বর্গকে নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্থান বলিয়া ভ্রম করে!

ভানু স্থির করিল, এই দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে। এবং সেই উদ্দেশ্যে একদিন রাত্রে পাগলা-গারদের প্রহরীরা যখন কর্তব্য পালন উপলক্ষে নিদ্রিত, তখন সে সমস্ত পাগলকে সমবেত করিয়া এক সভার আয়োজন করিল।

আপনারা নিশ্চয় ভাবিতেছেন যে. এমন কখনো ঘটিতে পারে না। আমিও জানি ঘটিতে পারে না, বাস্তবে এমন অবস্থা ঘটে না, কিন্তু গল্পে হামেশাই ঘটিয়া থাকে, নতুবা গল্প-লেখা কঠিন হইয়া পড়ে।

ভানু বদ্ধোন্মাদগণের সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া সম্বোধন করিল—ভাইসব, ( অবশ্য দু'চারজন ভগ্নীও ছিল, তাহাদের আর স্বতন্ত্র সম্বোধন করিল না, তাহারাও আপত্তি করিল না, মুক্তোন্মাদ হইলে নিশ্চয়ই আপত্তি করিত )।

ভানু সকলকে অসুবিধার কথা জানাইল। এবং বলিল—ইহার প্রতিকার আবশ্যক। অধিকাংশ পাগলই বলিল, তাই বলিয়া মুক্তি চাই না এবং বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাই না।

ভানু বলিল—বাড়ী ফিরবার কথা আমিও বলি না। কেবল এমন অবস্থার উদ্ভব করতে হবে যাতে গারদের সুখ আর মুক্তির আনন্দ এক সঙ্গে পাওয়া সম্ভব হয়। সে বলিল - ইংরাজিতে যাকে বলে best of both the worlds—সেই প্রকার ব্যবস্থা করা দরকার।

সবাই শুধাইল—কি প্রকারে সম্ভব ?

ভানু বলিল—চলুন, গারদের প্রহরী ও অফিসারগণ এখন নিদ্রিত। আমরা বাহির হয়ে তাদের ধরে আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিই। আর আমরা তাদের পোষাক পরে তাদের স্থান অধিকার করি। তাহলেই পাগলা-গারদের বিরাম ও বাহিরের জগতের আরাম একত্রে পাওয়া যাবে।

সকলে তাহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া 'ভানুপ্রকাশ জিন্দাবাদ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ভানু সবিনয়ে বলিল—অন্য ধ্বনি করুন, বলুন 'বদ্ধোন্মাদ জিন্দাবাদ'।

সকলে সেই ধ্বনি করিল। এবং সবেগে বাহির হইয়া পড়িয়া নিদ্রিত প্রহরী, অফিসার, কেরানী, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি সকলকে এক-একটি পাগলের ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া নিজেরা তাহাদের পোষাক পরিয়া ঘরগুলির দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অতি অনায়াসে এই ব্যাপারটি ঘটিল। (পাঠকদের আবার স্মরণ করাইয়া দিই, ঘটনা যতই কঠিন হোক না কেন লেখক ইচ্ছা করিলে এমনি অনায়াসেই তাহা ঘটিয়া থাকে।)

কার্য সমাপ্ত হইলে ভানুপ্রকাশ চীৎকার করিয়া উঠিল—'Lunatics of the world unite !' সকলে সানন্দে সেই ধ্বনি করিল !

এহেন বিপর্যয় ও বিপ্লব কাটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও পরদিন যথারীতি প্রভাত হইল এবং পাগলা-গারদের কাজ যথারীতি পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। কেহ কোন প্রভেদ লক্ষ্য করিল না।

পাগলের ঘরের নূতন বাসিন্দারা নিজেদের পাগলা-গারদে বন্ধ দেখিয়া ভাবিল—সত্যই তাহারা পাগল, নতুবা এখানে তাহাদের ভরিবে কেন ? কাজেই তাহারা পাগলের মতো আচরণ করিতে লাগিল। তাহারা চেঁচায়, গান করে, ঝগড়া করে, মারামারি করে—আর দর্শক আসিলে বলে যে তাহারা পাগল নয়, পাগল ঐ বাহিরের কর্মচারীর দল।

আবার পাগলা-গারদের নতুন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ভূতপূর্ব পাগলের দল স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া স্বভাবের অনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল—অর্থাৎ তাহারাও চেঁচায়, গান করে, ঝগড়া করে, মারামারি করে আর দর্শক আসিলে বলে যে তাহারা পাগল নয়, পাগল ঐ ভিতরের খাঁচার লোকগুলা।

ইহা ছাড়া আর কি-ই বা বলিবার থাকিতে পারে !

দর্শকেরা বুদ্ধিমান। তাহারা খাঁচার ভিতরের কথা শুনিয়া হাসে, বলে, আহা !

আর বাহিরের কথা শুনিয়া গম্ভীর হয়, বলে, তা জানি !

ভানুপ্রকাশ এখন পাগলা-গারদের সর্বময় কর্তা সুখের চরমে সে উপনীত। তবে কিনা মানুষের ভাগ্য চক্রবৎ আবর্তিত হয়, আবার যদি সঙ্কটের দিন আসে, তাই সে এবার গোপনে গোপনে জেনুইন লুনাটিকের লক্ষণগুলি আয়ত্ত করিবার অভ্যাস করিয়া থাকে। সম্মুখে এতগুলি দৃষ্টান্ত থাকাতে তাহার খুব সুবিধা হইয়াছে।

এখানেই আমার গল্পের শেষ। কিন্তু গল্পের মরাল বা নীতিকথাটি এখনো বাকি আছে। সেই নীতিটি হইতেছে যে, দুনিয়ায় সকলেই পাগল। কিন্তু

পাগলামি নানা ধরনের বলিয়া এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীকে পাগল বলে। নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলিবে—বাপুহে! তোমাদের সকলেরই এক অবস্থা। ঘটনাচক্রে যদি এক আধটা প্রকৃতিস্থ লোক সত্যই জন্মগ্রহণ করে—তবে তাহাদের সমূহ বিপদ! এই বিপদ কাটাইবার একমাত্র উপায়: হয় তাহাদিগকে পাগল বলিতে হইবে, নতুবা পাগলের ভান করিতে হইবে। এ দুয়ের একটাও না করিতে পারিলে দুনিয়ার পাগলেরা মিলিয়া তাহাকে হয় মারিয়া ফেলিবে নয় পাগলা-গারদে পুরিয়া রাখিবে। সংসারে পাগলা-গারদের স্থান সঙ্কীর্ণ, কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে খাঁটি প্রকৃতিস্থ লোকের সংখ্যা একেবারেই অল্প। আমি তো জীবনে ঐ একটিমাত্র লোককে দেখিয়াছি—সে এই কাহিনীটির নায়ক ভানুপ্রকাশ। *

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে

# বস্ত্রের বিদ্রোহ

সহরের প্রান্তে রঞ্জু ধোপার বাড়ী। সহরের সবচেয়ে বড় ধোপা সে। আজকাল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইএর দিন কি না—তাই কেউ কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবা মাত্র নিজের নামের সঙ্গে সম্রাট্ উপাধি যোগ করে নেয়। রঞ্জু ধোপাও করে নিয়েছে—সে নিজেকে রজক-সম্রাট বলে, আমরাও বলবো।

রজক-সম্রাট্ রঞ্জু ধোপার বাড়ীতে সহরের ময়লা কাপড়-চোপড় সবচেয়ে বেশি আসে। রঞ্জু নিয়মিত সে-সব ধোলাই করে, ইস্ত্রি করে, বাড়ীতে বাড়ীতে দিয়ে আসে। এতে যা আয় হয়, তাতেই স্বচ্ছন্দে তার সংসার চলে যায়।

রঞ্জুর বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড একটা মাঠ। সেই মাঠে সারি সারি বাঁশের সঙ্গে দড়ি খাটানো, সেই সব দড়িতে কাপড়-চোপড় রৌদ্রে শুকায়। আজও শুকোচ্ছে। কত রকম কাপড় তার সংখ্যা গণনা করা বা বর্ণনা করা সম্ভব নয়—যতদূর দেখা যায় কেবল বাতাসে ঈষৎ উড্ডীয়মান কাপড়-চোপড়—যেন পাশাপাশি কুরু পাণ্ডবের তাঁবু পড়েছে। ধুতি, পাঞ্জাবী, সার্ট, কোট, পায়জামা, গেঞ্জি ফতুয়া, শাড়ী, শায়া, শেমিজ, ব্লাউজ, হাওয়াই শার্ট, বুশ শার্ট, পাগড়ি, বিছানার চাদর, এমন কত কি! মায় নামাবলী,

লঙটি ও কৌপীনও আছে—সংসারে যত রকম বিচিত্র মানুষ আছে, তত যেন বিচিত্র কাপড়! সংসারে বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাবে কাপড়ের বৈচিত্র্যের আভাসে। যদি কোন আকস্মিক প্রলয়কাণ্ডে সমস্ত মানবজাতি নিঃশেষে মুছে যায়, থাকে কেবল রঞ্জু ধোপার কাপড়ের দড়িগুলি, তবে ঐ থেকে মানুষের ইতিহাস সংগ্রহ করা অসম্ভব হবে না। তেমন বিপর্যয় ঘটলে মানুষের বিপন্ন ঐতিহাসিক ঠিক বলতে পারবেন যে এক সময়ে সংসারে স্ত্রী, পুরুষ, সৈন্য, অফিসার, কেরানী, সৌখীন লোক, কৌপীনবস্ত সন্ন্যাসী, পুরুৎ ঠাকুর, গাঁটকাটা, চোর ছ্যাঁচড় প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণনার অধিবাসী সব ছিল। ধোপার বাড়ী সংসারের ঘনীভূত প্রতীক, ধোপার খাতার হিসাব হচ্ছে গিয়ে মানব জাতির সূচীপত্র।

রঞ্জু ধোপার বাঁশের খোঁটায় হাজার হাজার কাপড় বাতাসে পৎ পৎ শব্দ করে উড়ছে, যেন মনুষ্যত্বের নিশান উড়ছে, যেন হাজার হাজার মানুষ ফিস ফিস শব্দে কানাকানি করছে, মাঠময় যেন একটা ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা চলছে। চলে চলুক, ততক্ষণ আমরা ধোপার বাড়ী সম্বন্ধে একটু আধ্যাত্মিকমূলক গবেষণা করে নিই।

সংসারের এক প্রান্তে শ্মশান আর এক প্রান্তে ধোপার বাড়ী। শ্মশানে এলে সবাই সমান, ধনী দরিদ্রে, মূর্খ বিজ্ঞে, জুচ্চোর ও সাধুতে আর ভেদ থাকে না। সবাই সমান চিতায় সমান সদ্‌গতি লাভ করে। ধোপার বাড়ীতেও কি তাই নয়? ওখানে সাধু ও দুর্জন, ধনী ও দরিদ্র, বিজ্ঞ ও মূর্খ, স্ত্রী ও পুরুষের সকলেরই বস্ত্র এক ভাঁটিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে সমানভাবে মথিত ও তাড়িত হতে থাকে—তারপরে সমানভাবে নিঙারিত ও নিষ্কাশিত হয় এবং রৌদ্রে শুষ্ক হবার উদ্দেশ্যে বিক্ষিপ্ত হয়—তাই বলছিলাম যে শ্মশান ও রজকালয় একই পর্যায়ভুক্ত, শ্রেণীহীন সমাজের শ্রেষ্ঠ নমুনা!

গীতাতে জীর্ণ বস্ত্রকে জীর্ণ দেহের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। ঐখানে শ্রীভগবানের সঙ্গে আমার মতের অমিল। জীর্ণ বস্ত্রকে জীর্ণ দেহের সামিল

বলা ঠিক হয়নি, বলা উচিত ছিল যে জীর্ণ বস্ত্র জীর্ণ মানবাত্মার মতো। বস্ত্রকে এ পর্যন্ত খাটো করে দেখাই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন যে সাজ-পোষাকেই মানুষের পরিচয় কেউ রাজা, কেউ ভিখারী, নতুবা উলঙ্গের কোন পরিচয় নেই। এত বড় যে বিশ্বকবি তিনিও ঠিক ধরতে পারেননি, বস্ত্র মাহাত্ম্যকে খর্ব করেছেন। জীর্ণ বস্ত্র জীর্ণ মানবাত্মার মতো। কেন? তবে দেখুন, জীর্ণ মানবাত্মা দেহ পরিত্যাগ করবার পরে নরকে যায়, অবশ্য পুণ্যবানেরা স্বর্গে যায় কিন্তু তাদের সংখ্যা আর কত! সামান্যই। সাধারণ নিয়ম এই যে মানবাত্মাকে নরকে দীর্ঘকাল দণ্ড ভোগ করতে হয়। রৌরব নামক নরকে জলন্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হতে হয়, মথিত, তাড়িত, আলোড়িত হতে হয়। এই সব প্রক্রিয়ার ফলে তার মলিনতার অবসান হলে আবার সেই সব মানবাত্মা সংসারে এসে নূতন জন্ম গ্রহণ করে! এ সব কথা আমরা সবাই জানি। জীর্ণ বস্ত্র সম্বন্ধেও কি একথা প্রযোজ্য নয়? নিশ্চয় প্রযোজ্য। জীর্ণ বস্ত্র, মলিন বস্ত্র সংসার পরিত্যাগ করে রৌরব নামক রজকালয়ে গিয়ে কি সঞ্চিত হয় না? সেখানে গরম জলের ভাঁটিরূপ রৌরব নরকে কি নিক্ষিপ্ত হয় না? তার পরে সে কি মন্থন, তাড়ন ও আলোড়ন! ক্রমে সেই সব প্রক্রিয়ায় তার মলিনতা দূর হয়ে গিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে সে নবীন রূপ ধারণ করে। তার পরে আবার স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে মানব-সংসারে ফিরে আসে, সপ্তাহব্যাপী বা মাসব্যাপী জীবন কাল ভোগ করে, নূতন মালিন্য সঞ্চয় করে—আবার ফিরে যায় রজকালয়রূপ রৌরব নরকে—সেখানে দণ্ড ভোগ দ্বারা মালিন্য ক্ষয় হলে আবার সংসারে ফিরে আসে—এমনি করে জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে বস্ত্ররূপী মানবাত্মার লীলা চলতে থাকে। কাজেই বুঝতে হবে যে জীর্ণ বস্ত্র জীর্ণ দেহের মতো নয়, জীর্ণ মানবাত্মার সামিল। একবার এই সত্যটাকে স্বীকার করলে—বস্ত্রের মাহাত্ম্য বোঝা সহজ হবে—আর বর্তমান গল্পটিরও সম্যক রসগ্রহণের পন্থা সরল হয়ে আসবে।

এই অত্যাবশ্যক ভূমিকার পরে এবারে ফিরে আসা যাক্ রজক সম্রাট

রজ্জু ধোপার বাড়ীতে। রোদে মেলে দেওয়া কাপড়গুলো বাতাসে পৎ পৎ শব্দ করছিল—ওগুলো যে বস্ত্র মাত্র নয়, নবায়মান মানবাত্মা এ কথা মনে হবামাত্র ঐ পৎ পৎ শব্দ এবং তার অর্থ বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে—একটু কান পেতে থাকলেই ঐ শব্দার্থকে সুসংলগ্ন কানাকানি বলে মনে হবে। এবারে কাপড়গুলোর কথাবার্তা অনুসরণ করা যাক্—

হাওয়াই সার্ট হাওয়ায় দুই হাত তুলে বল্‌ল—নাঃ, আর সহ্য হয় না।

ধুতিখানা মস্ত নিশান উড়িয়ে দিযে বল্‌ল—ঠিক বলেছো ভাই। ওদের অত্যাচার, অবিচার আর কত কাল সহ্য করবো। এবার তোমরা তরুণেরা এসেছো, যা হয একটা ব্যবস্থা করো।

শায়া, শাড়ী, ব্লাউজের উত্তেজনাই যেন কিছু বেশি, তিনজনের কণ্ঠে তিনশ' জনের ঝঙ্কার তুলে তারা বল্‌লো—মানুষের দেহের অত্যাচার একেবারেই অসহ্য! আমাদের গাযে চড়িয়ে ভাবে তারাই যেন সব! আমরা নিতান্ত বাহুল্য মাত্র!

শাড়ী বল্‌ল—আমাকে গায়ে জড়িযে মেয়ে মানুষ নিজেকে রূপসী ভাবে! রামঃ! মেয়ে মানুষের আবার রূপ! তবু যদি না তার পনেরো আনাই আমার কাপড়ে না হ'ত। একখানা কঞ্চির উপরে আমাকে জড়ালেও তাকে সুন্দরী মনে হয়!

শেমিজ বল্‌ল—অথচ ওদের ভাবটা দেখ না! যেন আমাদের উপরে কৃপা করেই আমাদের পরিধান করে থাকে!

ব্লাউজ বল্‌ল—দেমাক দেখে আর পারিনে! মুখে আগুন!

ওঃ কি ঝাঁঝালো মধুর রব—ঐ ব্লাউজ শেমিজ শাড়ীগুলোর।

এমন সময় কতকগুলো হাত-কাটা হাফ শার্ট এগিয়ে এসে বল্‌ল—মশাই, এত যুক্তি-তর্ক কিসের? বিচার সে পরে হবে—আগে তো একটা রিভলিউশন করে ফেলা যাক। দেখা গেল যে ওদের বর্ণপরিচয়ে শ একটা মাত্র—আর সেটার উচ্চারণ ইংরেজী 's'-এর মতো!

ধুতি বল্‌ল—কিন্তু রিভলিউশনটা কার বিরুদ্ধে করবে ?

হাফ শার্ট বলল—কেন মানুষেব বিরুদ্ধে। তাদের জন্যই তো আমাদের দুর্দশা ! আমরাই তো মানুষকে মনুষ্যত্ব দিয়েছি—কাউকে রাজা, কাউকে মন্ত্রী, নাজির, উজীর বানিয়েছি—আমাদের বাদ দিলে ওরা তো সব একই রকম ! অথচ দেখুন মশাই সব, ওরা বলে আমরা নির্জীব, আমরা বস্ত্রখণ্ড মাত্র ! আমাদের যেমন তেমন খুসি কাটাকুটি, ছাটাছুটি করে—ইস—কি অত্যাচার ! হাফ সার্ট নিজের বাগ্মিতায় কাবু হয়ে ধুঁকতে লাগলো !

এমন সময়ে একখানা নামাবলী অগ্রসর হয়ে এসে বল্‌ল—এ বাক্য সঙ্গত। আমরাই প্রভু, মনুষ্যই দাস ! মানুষে যে চাতুর্বর্ণের অহঙ্কার করে থাকে—তা আমাদের সমাজ থেকেই গৃহীত। বস্ত্র-সমাজে চতুর্বর্ণ প্রচলিত,—রেশম, পশম, সুতি ও চামড়া। আমাদের অনুকরণেই ওরা নিজ সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র চার বর্ণের প্রচলন করেছে। আরে রাধা গোবিন্দ ! ওরা কি মানুষ ! তারপরে বল্‌ল—বর্তমানে নামাবলীর প্রতি ওদের অবজ্ঞার অন্ত নাই।

হাফ শার্ট অর্দ্ধোক্ত স্বরে বল্‌ল—ঠিকই করে—নামাবলী আবার মানুষ—অর্থাৎ আবার বস্ত্র ! আমার হাতে শাসনভার পড়লে নামাবলী কেটে মজদুর ভাইদের পাগড়ি করে দিই।

তখন ভোটে স্থির হল যে মানুষের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ করতে হবে ! বিদ্রোহের প্রধান লক্ষণ—( অনেক স্থলেই প্রধান, শেষ ও একমাত্র লক্ষণ ) একটা শোভাযাত্রা করা। বস্ত্রের শোভাযাত্রা বের হল। ধুতি, চাদর, শার্ট, পাঞ্জাবী, হাওয়াই শার্ট, কোট, পাজামা, ব্লাউজ শাড়ী, শায়া শেমিজ সারি সারি হাঁকতে হাঁকতে চলল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ ! যেন কবন্ধের শোভাযাত্রা ! সকলের দেহ আছে কিন্তু কারো মাথা নাই ! শোভাযাত্রায় মাথা থাকলে বিদ্রোহ তেমন জমে না !

পিছনে পিছনে লঙটি, কৌপীন, নামাবলীর দলও চলল—কিন্তু বেশ বুঝতে

পারা যায় যে বিদ্রোহীদের দলে তারা অনাদৃত, উপেক্ষিত, অবান্তর ও অন্ত্যজ।

শার্ট পাঞ্জাবী কোট ব্লাউজ শায়া মানুষের সমান হতে চায় তাই বলে লংটি, কৌপীন, নামাবলীও তাদের সমান হতে চাইবে—এ তাদের অসহ্য! আমি বড়র সমান হবো—কিন্তু ছোট আমার সমান কেন হতে পারবে না—এখানেই তো সাম্যবাদের আসল রসটা!

মানুষেরা যে-যার ঘরে দুপুরবেলা পড়ে ঘুমোচ্ছিল, চীৎকার শুনে তারা জেগে জানলা দিয়ে মুখ বের করে দেখে—বাঃ বেড়ে মজা, কাপড়ের দল চলেছে, ভিতরে কোন মানুষ নেই, একেবারে অন্তঃসারশূন্য অবস্থা! এমন অদ্ভুত দৃশ্য আর আগে কখনো দেখেনি!

কাপড়ের দল হাঁকছে—ভাই সব, তোমরা যে যেখানে আছ মানুষের সংস্পর্শ ছেড়ে চলে এসো—আজ আমরা বিদ্রোহ করে তবে ছাড়বো।

এই রব শোনবামাত্র মানুষের ঘরের বাক্সের, এমন কি গায়ের শার্ট পাঞ্জাবী, ব্লাউজ, ধুতি ইত্যাদি লাফিয়ে লাফিয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে সুরু করলো! মানুষ দেখে এ কি মুস্কিল—পাঞ্জাবী, শার্ট আপনি গা থেকে খসে উড়ে যাচ্ছে—এমন কি ধুতিখানারও সেই পথ! ফলে দাঁড়ালো এই যে মানুষের ঘর থেকে বের হওয়া অসম্ভব হল! কোন রকমে জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখে, কেউ কেউ হাত বাড়িয়ে পলায়মান কাপড়খানাকে ধরতে চেষ্টা করে—কিন্তু তার বেশি আত্মপ্রকাশ করবার সাহস কারো নেই!

মানুষের দুর্দশা দেখে ভূতপূর্ব বস্ত্রগুলোর সে কি হাসি!

কেউ বলে—কেমন, এখন তোমাদের মনুষ্যত্ব থাকে কোথায়?

কেউ বলে—খুব যে দু'বেলা জলে ভিজিয়ে নিঙড়'তে, এখন লাগছে কেমন?

কেউ বলে—নিজের দোষে আমার গা ক্ষতবিক্ষত করে স্চ দিয়ে শেলাই করে কি যন্ত্রণাই না দিয়েছ?

কেউ বলে—পারো তো সব ছেড়ে বেরিয়ে এসে ধরো—অমন করে অর্ধ

প্রকাশিত হয়ে আছ কেন? তখন বস্ত্রের শোভাযাত্রার মধ্যে যেমন হাসি-কৌতুকের ধুম পড়ে গেল, ঘরে ঘরে মানুষের দেহে মনে তেমনি আতঙ্ক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব!

বিপ্লব আর কাকে বলে?

এই রকমে বিপ্লব সমাধা করে সেই বস্ত্রের শোভাযাত্রা প্রকাণ্ড এক মাঠে এসে সমবেত হল—সেখানে সভা হবে—আর বিপ্লবলব্ধ সম্পত্তির কালনেমির লঙ্কা ভাগ কাণ্ড হবে। বিপ্লবের সূচনায় শোভাযাত্রা আর অন্তে মহতী জনসভা! এবারে সেই বস্ত্রীয় জনতার মহতী সভা আরম্ভ হল।

হাওয়াই শার্ট সভাপতি হলেন। তিনি যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা উদ্গীরণ করলেন তা লেখা বাহুল্য--কারণ পথেঘাটে তেমন বক্তৃতা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল মানুষের সংস্পর্শে থাকবার ফলে হাওয়াই শার্ট সে বক্তৃতা আয়ত্ত করে নিয়েছেন।

প্রথমে সভায় স্থির হল যে এবারে বস্ত্রের রাজত্ব সুরু হবে—স্বাধীনভাবে তারা জীবনযাত্রা আরম্ভ করবে—মানুষের কোন প্রভাব থাকবে না।

তারপরে কর্মকর্তা নির্ধারণের পালা। এখানেই বাধলো গোল।

সংসারে শার্ট কোট পাঞ্জাবী পায়জামা ব্লাউজ শেমিজের সংখ্যা আর কত? অধিকাংশই যে লংটি, কৌপীন আর ছেঁড়া কাঁথা। এরা আর কোন গুণে না হোক নিছক সংখ্যার গৌরবে সকলের চেয়ে বেশি। কাজেই ভোটের ব্যাপারে এদের ঠেকানো সম্ভব নয়।

শার্ট কোটের দল দেখল এ কি মুস্কিল! বিপ্লব করলাম আমরা! স্লোগান হাঁকলাম আমরা—আর কেবল হাতের জোরে অর্থাৎ হাতের সংখ্যার জোরে এরা সব কর্মকর্তা সাজবে! তবে এমন বিপ্লবে কি কাজ ছিল—এর চেয়ে যে মানুষের দাসত্বও ছিল ভালো—মানুষ আর যাই হোক লংটি, কৌপীনের চেয়ে অনেক বেশি অভিজাত! শার্ট কোটের দল যখন এই রকম চিন্তা

করছে তখন লংটি কৌপীন ছিন্ন কাম্থারা এসে তাদের বিষম আক্রমণ করলো! উঃ সে কি ভয়াবহ যুদ্ধ!

প্রথমে শার্ট কোটেরা বোঝাতে চেষ্টা করলো যে ও হে, ছিন্ন কন্থার দল, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমরা বিপ্লব করলাম—আবার এখন সেই উদ্দেশ্যেই দেশ শাসন করবো। কিন্তু বুদ্ধির অল্পতাবশতঃ ছিন্ন কন্থার দল সে যুক্তি গ্রহণ করতে পারলো না। তখন লড়াই সুরু হল! কোথায় লাগে তার কাছে রুশ-জার্মানীর যুদ্ধ। অবশ্য দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন এক রাশ কাপড় মাঠের মধ্যে হাওয়ায় লুটোপাটি খাচ্ছে—কিন্তু আসলে তা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। কত জামার যে হাতা ছিঁড়ে গেল, কত পায়জামার যে পা খ'সে গেল—কত ব্লাউজের যে বক্ষ বিদীর্ণ হল তার লেখাজোখা নেই! নামাবলা মশাই দূর থেকে সেই যুদ্ধ নিরীক্ষণ করে মন্তব্য করলেন—অহো, কি ভয়ানক সংগ্রাম! যেন কুরু-পাণ্ডবের আহব!

ইতিমধ্যে রাত্রি এসে পড়ল। অন্ধকার রাত্রি। সেই অন্ধকারের সুযোগে মানুষেরা ঘর ছেড়ে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হল। তাদের হাতে বালতি বালতি জল। তখন মানুষে সেই সংগ্রামরত বস্ত্র জনতার গায়ে জল ঢালতে সুরু করে দিল! জল পড়লেই কাপড় কাবু! তারা ভিজে ন্যাকড়া হয়ে যায়—ভিজে বেড়ালটির মতো! শুষ্ক অবস্থার সে তেজ, সে চঞ্চলতা তখন আর তাদের থাকে না।

হঠাৎ গায়ে জল এসে পড়ায় বস্ত্রের জনতা চীৎকার করে উঠল—এ কি! এ কে! কি সর্বনাশ! কিন্তু মানুষে কোন কথা বলে না—কেবল জল ঢালে! আর গায়ে জল লাগবামাত্র বীর পুরুষেরা ঝুপ ঝুপ করে ভেজা ন্যাকড়া হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, মানুষে অমনি তাকে তুলে ঝোলার মধ্যে ভ'রে ফেলে! এমনি জল ঢালা, আর ভেজা কাপড় সংগ্রহ করা চলল অনেকক্ষণ ধরে—ক্রমে সবগুলি কাপড়কে—হাওয়াই শার্ট থেকে আরম্ভ করে কৌপীন ও ছেঁড়া কাঁথা—সবগুলোকে মানুষে ঝোলায় ভ'রে ফেলল! আর রাত্রির অন্ধকার থাকতে

থাকতেই বাড়ী ফিরে এসে সবগুলোকে রজক সম্রাট্ রঞ্জু ধোপার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল--বলে পাঠালো, এবারে সাবধানে একটু পাহারা দিয়ো।

তার পরে মানুষে খবর পাঠালো নেয়ামৎ দর্জির কাছে—বলে পাঠালো অনেক সূঁচ সূতো যেন তৈরি রাখে, বিষম ঝড়ে কাপড়চোপড় ছিঁড়ে গিয়েছে —বেশ করে শেলাই করে দোরস্ত করে দিতে হবে!

পরদিন ভোরবেলা বিদ্রোহী বস্ত্ররা রঞ্জু ধোপার ভাঁটিরূপ রৌরব নরকে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিধিমতো তাড়িত মর্দ্দিত আলোড়িত হতে লাগলো। রঞ্জু তার ছেলেমেয়েদের বলে দিল, এখানে সব বসে থাকবি, কাপড়গুলো আবার যেন ঝড়ে উড়ে না পালায়! ওদিকে নেয়ামৎ দর্জি সূঁচ-সূতো নিয়ে প্রস্তুত!

হাওয়াই শার্ট মনে মনে ভাবছে—**objective condition** প্রস্তুত না হতেই সুরু করে দিলাম!

পাঞ্জাবীটি ভাবছে—কেন মিছামিছি হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লাম!

ব্লাউজটি ভাবছে—এখন কোন রকমে ফিরে গিয়ে সেই মেজগিন্নির আল-মারিতে ঢুকতে পারলে হয়।

শেমিজ তার মনোভাব বুঝতে পেরে বলল—তা হবে না দিদি, তোমার হাতটা ছিঁড়ে গিয়েছে—এবার ফিরে গিয়ে তোমাকে গিন্নির গায়ে আর উঠতে হবে না—ঝির মেয়ের গায়ে উঠবে!

ব্লাউজ ঝাঁঝালো স্বরে বললো— আচ্ছা! আচ্ছা! তোমাকে গিয়ে এবারে ঘর-মোছা ন্যাতা হতে হবে, দেখে নিয়ো!

লংটি, কৌপীনের দল ভাবলো—আমাদের রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে!

নানাবলী মশাই ভাবলেন—অহো, প্রাণ যখন রক্ষা পেয়েছে মানটাও অবশ্যই রক্ষা পাবে—

আর বর্তমান বক্তা ভাবছে—চৌদ্দ মিনিট বোধ করি ফুরিয়ে এলো—আর তো টানতে পারি না। *

---

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে

# খড়ম

সংসারে নিত্যব্যবহার্য অনেক জিনিস ক্রমে লোপ পাচ্ছে—আর তার জায়গা নতুন জিনিসে অধিকার করে নিচ্ছে—এ সকলেরই প্রত্যক্ষ। এক সময়ে ঘি পাওয়া যেতো—বস্তুটা ছিল গব্য, এখন ঘি হয়েছে উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জ ঘি নানা নাম নিয়ে, নানা ধরনের লেবেল এঁটে বাজার ছেয়ে ফেলেছে। আর কিছুদিন পরে--গব্য ঘৃতের স্মৃতিটুকুও মানুষের মন থেকে মুছে যাবে।

তারপর দুধের প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। ওটাও ছিল গব্য। এখনও অবশ্য দুধ পাওয়া যায়, মাখন যা পাওয়া যায় তার রংটা গব্য দুধের মতোই বটে—তবে তার মধ্যে গরুর দায়িত্ব কতখানি তা বিশেষ সন্দেহের বিষয়! এ রকম চল্‌লে লোকে ক্রমে ভুলেই যাবে যে দুধ বস্তুটা গরু নামে একটা জন্তুকে দোহন করে পাওয়া যেতো।

এ সব নিত্যব্যবহার্যের তালিকাভুক্ত। প্রাণীর ইতিহাসের দিকে তাকালে এমন সব অতিকায় জন্তুর নামটাম ইতিহাসে জানতে পাওয়া যায়—যারা এককালে পৃথিবীতে বিচরণ করতো কিন্তু এখন সবংশে লোপ পেয়েছে। শুধু তাদের চিহ্ন আছে যাদুঘরে, নয় ইতিহাসের পাতায়। বনে বা চিড়িয়াখানায় তাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন মাত্র রেখে যায়নি।

এমনি করে কি নিত্যব্যবহার্য, কি দূরগত সত্য অনেক বস্তু ও জন্তু-জানোয়ার লোপ পেয়ে আসছে।

ঐ তালিকাতেই আরও একটা জিনিসের নাম যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে —সেটি আর কিছুই নয়, মানুষের কাষ্ঠনির্মিত পাদুকা বিশেষ--খড়ম।

খড়ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক, কারণ এখনো কোন কোন মানুষের পায়ে ও জিনিসটা যে না দেখতে পাওয়া যায়, তা নয়। কিন্তু তা স্পষ্টত: বিলোপের পথে। আর কিছুদিন পরে খড়ম শুধু কিম্বদন্তীর মধ্যেই থাকবে, সংসারের পথে আর তার দেখা পাওয়া যাবে না।

খড়মের চলন এ দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে আছে। সেকালের মুনি-ঋষিরা প্রায় সকলেই পায়ে খড়ম পরতেন, অবশ্য তাঁদের কারো সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, তবু যে বলছি তার কারণ ও বিষয়ে কিম্বদন্তী অত্যন্ত স্পষ্ট। তা ছাড়া তাঁরা ছিলেন বনবাসী। বনের গাছ কেটে এক টুকরো কাঠকে খড়মে পরিণত করা মোটেই কঠিন নয়। সেই অনায়াস উপায়কে অবলম্বন করেই প্রাচীন কালের মুনি-ঋষিরা খড়ম তৈরি করে নিতেন। আরও একটা প্রমাণ এই যে একালে এখনো যাঁদের পায়ে কোথাও কোথাও খড়ম দেখতে পাওয়া যায় সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা সেকালের মুনি-ঋষিদের আধুনিক বংশধর। অবশ্য তাঁরা আর নিজের হাতে খড়ম তৈরি করে নেন না, দোকান থেকে সরাসরি কিনে কাজ চালান।

যদিচ খড়ম সামান্য এক জোড়া পাদুকা মাত্র, তবু তাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় যেহেতু এক জোড়া খড়মের ইতিহাসই এ দেশের, ভারতবর্ষের ইতিহাস। অর্থাৎ যথাসময়ে, যথাস্থানে নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির পায়ে খট্‌খট্‌ শব্দকারী খড়ম থাকলে এদেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য প্রকার হতে পারতো।

আপনারা সকলেই দুর্বাসা কর্তৃক শকুন্তলাকে অভিশাপ দানের কাহিনীটি জানেন। কিন্তু কখনো কি ভেবেছেন যে কি ভাবে এ ঘটনা সম্ভব হল? বেচারা শকুন্তলা গালে হাত দিয়ে নিমীলিত চক্ষু হয়ে ( গভীর চিন্তার সময়ে

চক্ষু প্রায়ই নিমীলিত হয়ে আসে) দুষ্মন্তের কথা ভাবছিল। এমন সময়ে সেখানে সেই তপোবনে অকস্মাৎ দুর্বাসা মুনি এসে উপস্থিত।

কিন্তু শকুন্তলা তা কেমন করে জানবে? তার মন যে তখন দুষ্মন্তের রাজপ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে অন্ন-সন্ধানরত। দুর্বাসা ভাবলেন যে শকুন্তলা তাঁকে অবজ্ঞা করলো, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাপ দিলেন। ঘটনাটির বাহুল্য বর্ণনা করতে চাই না, যেহেতু কালিদাস বিস্তৃতভাবে লিখেছেন এবং বোধ করি আমি যে রকম লিখতে পারতাম তার চেয়ে কিছু ভালো করেই লিখেছেন।

এখন আপনারা জানেন দুর্বাশার শাপের ফলে শকুন্তলার জীবন, দুষ্মন্তের জীবন, কালিদাসের কাব্য এক অভাবিত রূপ নিয়েছে। কিন্তু এ সবের মূলে কি? ঐ খড়ম বা ঐ খড়মের অভাব! দুর্বাসার পায়ে যদি সেদিন খড়ম থাকতো, তবে কি বেচারা শকুন্তলার এ দুর্ভোগ হয়? দূরাগত খড়মের খট্‌খট্‌ শব্দে সে নিশ্চয় পূর্বাহ্ণেই "ওয়ারনিং" পেতো, কারণ তার চক্ষু নিমীলিত হলেও কানে সে তুলো দিয়ে নিশ্চয় বসেনি! আর পূর্বাহ্ণে খড়মের ধ্বনি শুনলে যথাসময়ে যথাভাবে দুর্বাসাকে স্বাগত ও আতিথ্য প্রদান অবশ্যই সে করতো। তা হলে দুর্বাসার অভিশাপ দানের কারণ ঘটতো না আর তা না ঘটলে শকুন্তলার জীবন, দুষ্মন্তের জীবন ও কালিদাসের নাটকখানি সম্পূর্ণ অন্য আকার যে লাভ করতো তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য তাতে করে শকুন্তলার সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়া অপ্রাসঙ্গিক হ'ত না। কিন্তু এ কথা কে নিশ্চয় করে বলতে পারে যে সে সন্তানের নাম ভরত হ'ত? কে বলতে পারে যে দুষ্মন্ত সেই সন্তানকে আপন উত্তরাধিকারী রূপে গ্রহণ করতেন? তাতে যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে তবে সেই সন্তানের নামে এদেশ ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হ'ত না। হয়তো এ দেশের প্রাচীনতর নাম জম্বুদ্বীপই থেকে যেতো। আর এ দেশের নাম ভারত না হলে আমরা ভারতীয় বলে পরিচিত হতাম না, জম্বুদ্বীপ অনুসারে হয়তো জাম্বুবান বলে পরিচিত হ'তাম। তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন যে এক জোড়া খড়মের অভাবেই এ দেশের ইতিহাস কি বিচিত্র

পথ গ্রহণ করেছে? অতএব খড়মকে সামান্য পাদুকামাত্র মনে করা উচিত নয়।

সেকালের মুনি-ঋষিরা যে খড়ম পড়তেন তার একটি বিশেষ সার্থকতা ছিল। তাঁরা সকলেই প্রায়ই বদরাগী ছিলেন, সামান্য ত্রুটিতেই অভিশাপ দিয়ে বসতেন। এমন সব লোকের পায়ে এক জোড়া করে খড়ম থাকলে তপোবনের শিষ্য ও অনুচরদের পক্ষে আগে থেকে "ওয়ার্নিং" পাওয়া সহজ হয়, বেগতিকে পড়ে আর তাদের শকুন্তলার অবস্থা ঘটে না! আমার ধারণা এই যে সেকালের শিষ্যেরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে মুনি-ঋষিদের খড়ম জোগাতো। তাঁরা ভাবতেন—শিষ্যদের ভক্তি—কিন্তু আসল কথা ওটা ভক্তি নয়, ভয়; অভিসম্পাতের ভয়ে শিষ্যরা এই কাষ্ঠ-পাদুকা মুনি-ঋষিদের নিজেদের খরচে 'সাপ্লাই" করতো।

তপোবনে যেমন শিষ্য থাকতো তেমনি শিষ্যাও থাকতো এবং তাদের মধ্যে সব সময়ে যে আলাপ-আলোচনা হ'ত তা যে ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে নয়, তা রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' কবিতাটি থেকেই অনুমান করতে পারা যায়। এখন ওসব কথা গুরুর কর্ণগ্রাহ্য হোক-কারো তা অভীষ্ট নয়। আমার আরও একটা ধারণা, যেদিন দেবযানী ও কচে বিদায় অভিশাপের আলাপ-আলোচনা চলেছিল তার আগের দিনে বুদ্ধিমতী দেবযানী পিতা শুক্রাচার্যের জন্য এক জোড়া নূতন ও ভারি খড়ম "সাপ্লাই" করে দিল, যাতে অনেকটা দূর থেকে তার আওয়াজ নিভৃত আলাপচারিণীর কানে এসে পৌছতে পারে। ফলকথা মারাত্মক "রেটল্ স্নেক্"-এর লেজের হাড় খড়্ খড়্ শব্দ ক'রে যেমন নিরীহ প্রাণীকে আগে থেকে সাবধান করে দেয়, মুনি-ঋষিদের পায়ের খড়মও অনেকটা সেই কার্য সাধন করতো।

অতএব প্রমাণ হ'ল যে খড়ম শুধু খড়মমাত্র নয়, ও জিনিস একাধারে ভক্তিভাজনের পাদুকা এবং নিরীহের আত্মরক্ষার উপায়! হায়, আমাদের কি দুর্বুদ্ধি! এমন ডবল উপকারী বস্তুকে আমরা অবহেলা করতে আরম্ভ করেছি!

সেকালে অর্থাৎ একালেই কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাড়ির কর্তারা পায়ে খড়ম পরতেন। তাঁর খড়মের সতর্ক বাণীতে বাড়ির চাকরবাকর থেকে পুত্র পুত্রবধূ মায় মেয়ে ও গৃহিণী পর্যন্ত সবাই সাবধান হবার সুযোগ পেতো—কর্তা যখন অকুস্থলে এসে পৌঁছতেন, দেখতেন সমস্ত ঠিক আছে, কোথাও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেনি, তাঁর মনে একটা প্রসন্ন অহমিকার ভাব দেখা দিত—তিনি ভাবতেন আমি যতক্ষণ আছি ইত্যাদি।

একালে খড়মের স্থান অধিকার করেছে, স্লিপার, স্যাণ্ডেল জাতীয় পাদুকা। তাতে করে আগে থেকে যথোচিত "ওয়ার্নিং" পাওয়া যায় না—আর তার ফলে অনেক সময়েই বিদায় অভিশাপের পালায় অভিশাপটা আসে দেবযানীর মুখ থেকে নয়, কর্তার মুখ থেকে, এমন কি তাঁর যষ্ঠি থেকে এলেই বা ঠেকায় কে? খড়মের অপরিহার্য উপযোগিতা আমরা বুঝতে পারিনি বলেই খড়ম এখন বিলোপের পথে। তবে আশা করা যায় সমাজে "ফ্রী লাভ"-এর বহুল প্রচলনের সঙ্গে খড়মেরও পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী!

এখন আগের মতো আর অসংখ্য খড়ম প্রস্তুত হয় না, তবে সে কাঠগুলো কি কাজে লাগে? অন্যান্য যে কাজেই লাগুক, কলকাতা সহর সম্বন্ধে নিশ্চয় করে বলা যায় যে, এখানকার খড়মের কাঠগুলো সব দোকানের সাইনবোর্ড হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ লোকে আগে যে কাঠে খড়ম তৈরি করতো এখন তা দিয়ে সাইনবোর্ড তৈরি হয়। এর প্রমাণ কি? প্রমাণ পাওয়া কঠিন নয়, কিন্তু যখন সে প্রমাণ পাওয়া যায় তা শিরোধার্য করা অত্যন্ত কঠিন। ঝড়ের সময়ে কল্‌কাতার রাজপথে কখনো বেরিয়েছেন? মাঝে মাঝে ঝড়ের বেগে নিক্ষিপ্ত দোকানের সাইনবোর্ড মাথায় এসে যখন সশব্দে পড়ে—তখন কি মনে হয় না যে ওখানা সাইনবোর্ড নয়, ক্রুদ্ধ দুর্বাসার স্বহস্ত নিক্ষিপ্ত প্রচণ্ড খড়ম! শুধু দুর্বাসা কেন, রাগী লোকের হাতে খড়ম একটি মারাত্মক অস্ত্র! হাজার হাজার বছর ধরে খড়মের কাঠের মজ্জায় অস্ত্ররূপে নিক্ষিপ্ত হবার ঝোঁক সঞ্চিত হয়ে রয়েছে—তাই

সাইনবোর্ডরূপে জন্মান্তর পেয়েও পূর্বতন অভ্যাস ভুলতে পারেনি, তাই ঝড়ের সুযোগ পাবা মাত্র নিরীহ পথচারীর মাথায় প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আসলে সে খড়মের বংশধর। কাজেই সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে খড়ম আর যে পথেই চলুক বিলোপের পথে যায়নি—কেবল রূপান্তর গ্রহণ করেছে এইমাত্র। এর পরেও যদি তার জন্য শোক হয় তবে ঝড়ের দিনে কল্‌কাতার রাজপথে বেরলেই চলবে—হঠাৎ মাথায় গাঁট্টা মেরে স্মরণ করিয়ে দেবে—আমি যাইনি, বলবে, ছিলাম পায়ে—এবার সাইনবোর্ড—উঠেছি মাথায়—অতএব হে নির্বোধ, আমার জন্য শোক না করে তাড়াতাড়ি এখন হাসপাতালে গিয়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার ব্যবস্থা করোগে। *

---

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে

# শার্দ্দূল

জোড়াদীঘি গ্রামে একটা বাঘ আসিয়াছে, লোকের পাঁঠা, ছাগল, ভেড়া আর রাখিল না। পাঁঠা, ছাগল আর কে দড়িতে বাঁধিয়া রাখে, আপন মনে চরিয়া বেড়ায়, আপন মনে বাড়ীতে ফিরিয়া আসে—এই তো নিয়ম। কিন্তু ক্রমে নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে লাগিল, সকালবেলায় যে পাঁঠা চরিতে যায়, সন্ধ্যাবেলায় আর সেটা ফেরে না। আজ এর পাঁঠা গেল, কাল ওর খাসী গেল, পরশুদিন রায়ের পাঁঠার বাচ্চা দুটা গিয়াছে, রমেশবাবু সখ করিয়া মালঞ্চির মেলা হইতে একটা ভেড়া কিনিয়া আনিয়াছিল, ভেড়া এ অঞ্চলে দুর্লভ, একদিন সেটাকেও আর পাওয়া যায় না। এ সমস্তই ঐ বাঘের কীর্তি।

বাঘটা বড়ই ধূর্ত, এ পর্যন্ত কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। তবে অনেকেই ডাক শুনিতে পাইয়াছে, বাংলা পাড়াগাঁয়ে বাঘের ডাক কে না শুনিয়াছে? কিন্তু ধূর্ত বাঘ কাহাকেও দেখা দেয় নাই। লোকে ভীত হইয়া উঠিল কবে বা ছোট ছেলে-মেয়েদের উপরে হামলা করে। তবে ভরসার মধ্যে এই যে বাঘটা নিশ্চয় ছোট, গোরু বাছুর ধরিতে চেষ্টা করে নাই, পাঁঠা ছাগলেই সন্তুষ্ট থাকে। মানুষেই সব সময়ে নিজের

সাধ্যানুসারে কাজ করিয়া উঠিতে পারে না। বাঘটা কখনো তাহার ব্যতিক্রম করে নাই—ধূর্ত আর কাহাকে বলে!

গ্রামের নরেন চক্রবর্তী প্রাণিতত্ত্বে এম-এ পাশ করিয়া গবেষণা করে, পূজার ছুটিতে সে বাড়ী আসিয়াছে। নরেন বলিল—বাঘ কখনই নয়, কেবল পাঁঠা ছাগল ধরে, বাঘের এমন স্বভাবই নয়।

অবিনাশ জমিদারের গোমস্তা, সে বলিল—কেন নয়? এ কি তোমাদের চিড়িয়াখানার বাঘ? বুনো বাঘের স্বভাব তোমরা জানবে কেমন করে? তোমাদের কেতাবী বাঘের কথা রেখে দাও।

নরেন হটিবার নয়, এবারে সে পি এইচ, ডি-র থিসিস সাবমিট করিবে, সে বলিল, আচ্ছা; বাঘের ডাক কেউ শুনেছ?

অনেকেই বলিল যে, শুনিয়াছে।

নরেন বলিয়া উঠিল, ভয় পেলে শিয়ালের ডাককেও বাঘের ডাক বলে মনে হয়।

অবিনাশ কলিকাতার বাবুর কথায় হাসিয়া উঠিয়া বলিল, বাঘের সঙ্গে আমরা ঘর করি, আমরা পাবো ভয়?

—বাঘের পায়ের ছাপ কেউ দেখেছ?

—খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই বাঘের পায়ের ছাপ দেখে বেড়াই—

—তবে কি করে বুঝলে যে বাঘ?

—আরে পাঁঠা ছাগলগুলো যে নিচ্ছে তাতে তো ভুল নেই—

—মানুষেও তো নিতে পারে—

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, আসর ভাঙিয়া গেল। কলিকাতার কেতাবী বাবুর অনভিজ্ঞতা আলোচনা করিতে করিতে সকলে নিজ নিজ বাড়ীতে প্রস্থান করিল।

জোড়াদীঘির সুরেন পোদ্দারের অবস্থা এক সময়ে ভালো ছিল। নিজের কিছু করিবার প্রয়োজন ছিল না, তাই সে সারাদিন গান বাজনা মজলিশ

লইয়াই থাকিত। তাহার আর একটি সখ ছিল—খাওয়া এবং খাওয়ানো। তার বাড়ীতে পাত পাড়ে নাই এমন লোক জোড়াদীঘিতে ও আশে পাশের গাঁয়ে কেহ ছিল না। খাদ্যের মধ্যে তাহার সবচেয়ে প্রিয় ছিল মাংস, পাঁঠার মাংস। বোধ করি একটি দিনও বিনা মাংসে তাহার আহার সম্পন্ন হইত না।

ক্রমে তাহার অবস্থা পড়িয়া আসিতে লাগিল—সেই সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবকে ভোজ দেওয়াও কমিয়া আসিল। কিন্তু তাহার নিজের নিয়মিত খাদ্যের তালিকা হইতে মাংসের পাট উঠিল না—তাহার যাহা কিছু ছিল - ঐ পাঁঠার মূল্যেই যাইত।

সুরেন বিবাহ করে নাই, লোকে বলিত বিবাহ করিলে স্ত্রী-পুত্রকে মাংসের ভাগ দিতে হইবে বলিয়াই বিবাহ করে নাই। ওটা অপবাদ মাত্র, আসল কারণ জীবিত পাঁঠা ও সুপক মাংসের ঝোল ব্যতীত জীবনের আর সবই তাহার ধারণার অতীত ছিল।

শেষে তাহার অবস্থা এমন হীন হইল যে, ভদ্রাসন ও সামান্য কয়েক বিঘা জমি ছাড়া আর কিছু রহিল না। তাহাতে পাঁঠা চলিবার কথা নয়, তবু পাঁঠা চলিতেই লাগিল। এবারে ব্যাপারটা গ্রামের একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল-- সুরেন পাঁঠা খায় কিরূপে ?

বাংলার পল্লীগ্রামের লোকে পরের সমস্যা আলোচনায় যেমন উৎসাহ ও আনন্দ পায় তেমন আর কিছুতেই নয়। সুরেন পোদ্দারের মাংসাহার সমস্যা জোড়াদীঘির এখন সবচেয়ে জটিল ও চিত্তাকর্ষক সমস্যা !

আরও জুৎ করিয়া পাঁঠার হাড় চিবাইবার উদ্দেশ্যে যেবার সুরেন কলিকাতা হইতে মজবুৎ করিয়া দাঁত বাঁধাইয়া আসিল সেবারে জমিদারের খাজনার দায়ে তাহার শেষ সম্বল কয়েক বিঘা জমি পর্য্যন্ত নীলাম হইয়া গেল।

ছেলেরা গান বাঁধিল :—

'তুই দাঁত বাঁধালি কি খাবি ?
জল হাওয়া কি চিবাবি ?'

তাহাদের গানে আরও ছিল :—

'বাঁধানো দাঁত বিক্রি কর,
পাঁঠা কিনে আনগে ঘর।
সে পাঁঠা তুই কেমনে খাবি
কি দিয়ে তুই দাঁত বাঁধাবি ?
পাঁঠার মতো পাঁঠা গেল
দাঁতের মত দাঁত
সুরেন কুপোকাৎ।'

গান শুনিয়া সুরেনের কালো মুখমণ্ডলে নূতন বাঁধানো দাঁত হাসিতে ঝক্‌ ঝক্‌ করিয়া উঠিল—ছেলেরা ভয়ে পালাইল।

প্রথমে প্রথমে পুরানো খাতিরে কেহ কেহ পাঁঠার বাচ্চাটা সুরেনকে দিত, কিন্তু এমন নিষ্কাম দান দীর্ঘকাল চ'লিতে পারে না, কাজেই সুরেনকে এবারে যে পন্থা ধরিতে হইল তাহা সাধু নয়।

সুযোগ পাইলে সুরেন পাঁঠাটা খাসিটা টান দিত। রমণীয় খাদ্যবস্তু না বলিয়া গ্রহণ করিলে চুরি করা হয় না, তাই টান শব্দটা প্রয়োগ করিলাম। কিন্তু এমতভাবে টান দেওয়ার উপর নির্ভর করিয়া নিয়মিত মাংসাহার সম্ভব নয়। বিশেষ তাহার উপরেই লোকের সন্দেহ হইবে। তখন সে আর একটি উপায় অবলম্বন করিল। রাতের বেলায় জঙ্গলের কাছে দাঁড়াইয়া একটি হাঁড়ি মুখে দিয়া সে গর্জন করিত, দূর হইতে সেই গম্ভীর আওয়াজ বাঘের ডাকের মতো শোনাইত। তখন পাঁঠার অন্তর্ধান ও বাঘের আবির্ভাব কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়া লোকাপবাদের হাত হইতে সুরেনকে নিষ্কৃতি দিল। সকলের দৃঢ় ধারণা হইল জোড়াদীঘিতে দারুণ বাঘ আসিয়াছে, আর আর সেই দুষ্ট বাঘটাই লোকের পাঁঠা, খাসি ধরিতেছে। এখন সেই বাঘটাকে শিখণ্ডির মতো দাঁড় করাইয়া সুরেন স্বচ্ছন্দে পাঁঠা, খাসি ধরিয়া খাইতে লাগিল। তাহার দাঁত বাঁধানো সার্থক হইল। স্বপক্ক মাংসের দুপক্ক হাড়

অর্ধনিমীলিতনেত্রে চিবাইতে চিবাইতে ছেলেদের গান স্মরণ করিয়া সে বলিত —এবার দেখে যা কি চিবাই ?

পরিতৃপ্ত আহারের পরে পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে আপন মনে রামপ্রসাদী সুরে গুন-গুন করিয়া গান ধরিত—

ওরে থাকতে গাঁয়ে পাঁঠা খাসী
মোর বাঁধানো দাঁত রয় উপাসী ?
এমনি করে চিবিয়ে হাড়
জোড়াদীঘি করবো উজাড়,
এই বুঝেছি তত্ত্ব সার।
আমি চাইনে গয়া, চাইনে কাশী,
থাকতে গাঁয়ে পাঁঠা খাসী।

তারপরে অনুচ্চস্বরে সে বলিয়া উঠিত, তারা ব্রহ্মময়ী মা, মৃত্যুর পরে আমাকে ছাগলোকে পাঠিয়ে দিয়ো মা, আর সেই সঙ্গে অক্ষয় দাঁত দিয়ো। এই বলিয়া দাঁত জোড়া খুলিয়া বালিশের পাশে রাখিয়া শুইয়া পড়িত, স্বপ্নে বোধ করি সে ছাগলোকে বিচরণ করিত।

সেদিন প্রাণিতত্ত্ব-গবেষক নরেন চক্রবর্তীর ভেড়ার বাচ্চাটি চুরি গেল। এটি সাধারণ ভেড়া মাত্র নয়, দুম্বা ভেড়ার বাচ্চা। সে কলিকাতায় থাকিতে অনেক দাম দিয়া এটি কিনিয়াছিল, গ্রামের লোকদের স্ফীতপুচ্ছ দেখাইয়া অবাক করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে নরেন গ্রামে আনিয়াছিল। তাহার আরও ইচ্ছা ছিল ভেড়াটির লেজের উপরে থিসিস লিখিয়া প্রমাণ করিবে যে, অবস্থা বিশেষে মানুষের মতোই ভেড়ার লেজও মোটা হইতে পারে—বস্তুতঃ তাহার লেজের সঙ্গে কেবল মাংসস্তূপ মাত্র নয়, নরেনের থিসিসও দোদুল্যমান ছিল। এখন এ হেন মেষশাবক অপহৃত হওয়ায় সে ক্ষেপিয়া উঠিল, বলিল, চলো অবিনাশ, সুরেন পোদ্দারের বাড়িটা খানাতল্লাসী ক'রে দেখি।

অবিনাশ বলিল—মন্দ বলো নি, সুরেন সকাল বেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে দেখেছি—এখন যাওয়া যেতে পারে।

তখন নরেন, অবিনাশ এবং আরও কয়েকজন সুরেন পোদ্দারের বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল।

কিন্তু কোথায় ভেড়ার বাচ্চা? বাড়ীর মধ্যে পাইল কোথাও একটা পাঁঠা বাঁধিবার দড়ি, কোথাও একখানা কাটারি, রান্নাঘরে পাইল রাঁধিবার তৈজস, শিলনোড়া এইসব। এগুলিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আর বাড়ীরই বা কি শ্রী! দৈন্যের শেষ দশায় উপস্থিত।

যখন তাহারা হতাশ হইয়া ফিরিতেছে তখন নরেন সুরেন পোদ্দারেব তক্তপোষের উপরে বিছানাটা উল্টাইয়া ফেলিল—আর তখনই চোখে পড়িল - একখানা বড় সাইজের খাতা। খাতাটির উপরে মোটা অক্ষরে লিখিত আছে—"জোড়াদীঘি এবং ও গায়রহ গ্রাম দিগরেব পাঁঠা-খাসীর আদম সুমারি।"

সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া খাতাখানা লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইযা দেখিতে লাগিল। হাঁ, এতক্ষণে একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মতো পাওয়া গিযাছে বটে!

জোড়াদীঘি ও আশে-পাশের গ্রামের কোথায় কাহার বাড়ীতে ক'টা খাসী বা পাঁঠা আছে, তাহাদের বযস কত, আনুমানিক ওজন কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খাতাখানায় লিখিত।

মাঝে মাঝে কোন কোন পাঁঠা বা খাসীর পাশে মন্তব্য লিখিত—'আজ এটাকে বাঘে ধরিবে।' কোথাও বা লিখিত—'আজ বাঘে ধরিল।'

ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে এ ওর দিকে চাহিল। খাতার শেষভাগে এক স্থানে মন্তব্য—'আজ নরেন চক্রবর্তীর ভেড়ার বাচ্চাটিকে বাঘে ধরিল, আহা কি নরম মাংস! এমন মাংস বাঘ অনেক দিন খায় নি।'

নরেন চক্রবর্তী চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল, অবিনাশ এবারে বিশ্বাস হ'ল তো! এবারে বুঝলে তো বাঘ কে?

অবিনাশ বলিল—এ যে মানুষ-বাঘ।

নরেন ব'লিল—আমি আগেই জানতাম! প্রাণিতত্ত্ব নিয়ে আমাদের কারবার কিনা!

তারপরে সে বলিল—আমি সহজে ছাড়ছি নে। ওর নামে, ক্ষতিপূরণের নালিশ করবো।

—কিন্তু নেবে কি? ওর আছে কি? দেখলে তো সব!

নরেন বলিল—আগে ডিক্রি তো পাই, তারপরে দেখা যাবে।

নরেন চক্রবর্ত্তী নালিশ করিয়া পঞ্চাশ টাকা ডিক্রি পাইয়াছে। বিচার একতরফা হইয়াছে, সুরেন সমন পাইয়াও আদালতে হাজির হয় নাই। নরেন পঞ্চাশ টাকার জন্য অস্থাবরী আটকের পরওয়ানা বাহির করিল, পরওয়ানা লইয়া আদালতের পিওন জোড়াদীঘিতে আসিল।

খুব ভোরবেলা নরেন অবিনাশকে বলিল—চলো ওর বাড়ীতে যাই।

অবিনাশ বলিল—চলো, কিন্তু নেবে কি? পঞ্চাশ টাকা ওকে পঞ্চাশ বার বেচলেও তো হবে না।

—নাই হোক। তা ছাড়া টাকার লোভে তো নালিশ করিনি, ওকে শিক্ষা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

তখন নরেন, অবিনাশ এবং আদালতের পিওন পরওয়ানা লইয়া চলিল—আরও দু'চারজন সঙ্গ লইল।

সুরেন তখনো নিদ্রিত। দরজা ঠেলিয়া তাহাকে তোলা হইল এবং আদালতের পিওন পরওয়ানা দেখাইয়া তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জানাইয়া দিল।

সুরেন বলিল—কিন্তু নেবেন কি?

বাস্তবিক লইবার মতো কিছুই নাই। পঞ্চাশ টাকা মূল্যের দূরে থাকুক—পাঁচ টাকা মূল্যেরও কিছু নাই!

সকলে অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পিওন ফিরিবে ফিরিবে করিতেছে,

এমন সময়ে নরেন সুরেন পোদ্দারের বালিশটি সরাইয়া ফেলিতেই বাঁধানো দাঁতজোড়া প্রকাশ পাইল, নরেন সোল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল—এই দাঁতজোড়া ক্রোক করলাম।

সুরেন বলিল ( মুখে দাঁত না থাকিলে যতটা স্পষ্টভাবে বলা যায় )—ও যে আমার দাঁত।

নরেন বলিল—ও তো এখন অস্থাবর। তোমার মুখের মধ্যে থাকলে স্থাবর হ'ত বটে! কি বলো পিওন সাহেব।

পিওন সাহেব এরূপ অদ্ভুত মাল কখনো ক্রোক হইতে দেখে নাই—তাই বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল। বিস্ময় কাটিলে বলিল—তা বটে! বিশেষ তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে যে মাল ক্রোকে যথারীতি সাহায্য করিলে নরেনবাবু তাহাকে পাঁচ টাকা বকশিস দিবে বলিয়াছিল।

সুরেন পোদ্দার নরেন চক্রবর্তীর হাত হইতে দাঁতজোড়া ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিবার আগেই সেই বহুমূল্য বস্তু নরেন পিওনের হাতে সমর্পণ করিল। সুরেন পিওনের দিকেও অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বুকের উপরে আদালতের ঝকঝকে চাপরাশখানা চোখে পড়ায় মাঝ পথে থামিয়া গেল।

তখন সকলে মিলিয়া বিজয়োল্লাসে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল আর বৈদান্তিক সুরেন একাকী শূন্য ঘরে দাঁড়াইয়া রহিল। জগৎটা যে মায়াময় খুব সম্ভব এই সত্যই সে হঠাৎ বুঝিতে পারিল।

তার পরদিন হইতে সুরেন পোদ্দারকে জোড়াদীঘিতে আর কেহ দেখিতে পাইল না। তার জীর্ণ ঘর দু'খানা ফেলিয়া রাখিয়া সে কোথায় চলিয়া গেল—কেহ সন্ধানও করিল না।

তাহার অন্তর্ধানের পর হইতে জোড়াদীঘিতে আর বাঘের ডাকও শোনা যাইত না, খাসী পাঁঠাও বাঘে লইত না।

নরেন চক্রবর্তী বলিত, আমাদের জীবজন্তু নিয়ে কারবার, আমি আগেই বুঝেছিলাম।

# ছবি

—মুখটা একটু তুলে বসুন তো?

মুখ তুলে দেখি অবিনাশ একটা ক্যামেরা বাগিয়ে দণ্ডায়মান।

—কি হবে?

—ক্যামেরা দিয়ে আর কি করে?

—ছবি তুলবে? এই অন্ধকারে?

—খনিতেই মণি থাকে।

ছবি তোলা আর হাত দেখানো বিষয়ে এমন লোক দেখিনি যার অসীম ঔৎসুক্য নেই। উপরে একটা ঔদাসীন্য দেখায় বলেই বুঝতে হবে মূলে আগ্রহ বেশি, যেমন কিনা অশ্লীল গল্প শোনায়, লোকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় বটে, কিন্তু মনটা ঘুর ঘুর করে ঐখানেই।

নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরেই মুখটা তুলে বল্‌লাম, যা হয় চটপট ক'রে ফেলো, আমায় এখনি বেরুতে হবে। (বেরুতে মোটেই হয়নি, তারপরেও আড়াই ঘণ্টা ব'সে ছিলাম)।

ছবি তুলবার কতকগুলি 'পোজ' আয়ত্ত ক'রেছিলাম ইংরিজি ছবির ম্যাগাজিনের কৃপায়, সে-সব আর প্রয়োগ করলাম না, অপব্যয় হবে, এই অন্ধকার ঘরে ছবি তোলা আর ঐ ক্যামেরা দিয়ে!

অবিনাশ দু'চার বার ক্যামেরা আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুট ক'রে কল টিপলো।

—নিন, ছুটি।

নিতান্ত উদার অবহেলায় বললাম · বাঁচা গেলো।

কিন্তু গেলো না, মনটা রইলো অবিনাশের ক্যামেরার সঙ্গেই।

—কাল একবার আসবেন।

—কেন ?

—ছবিখানা দেখবেন।

—আবার দেখে কি হবে ? নিজের চেহারা কি দেখিনি ! আচ্ছা দেখা যাবে যদি সময় পাই।

২

পরদিন সকলের আগে এমন কি ঘড়ির কাঁটারও আগে এসেছি। কি মুস্কিল, অবিনাশটা আসে না কেন ? কারো কি কথার ছাই ঠিক আছে !

এমন সময়ে মাষ্টার মশাই এলেন শীর্ণ দেহ ও তীক্ষ্ণ রসিকতা নিয়ে।

—কি, ছবি দেখলেন নাকি ?

—ছবি ? কোন্ ছবি ?

—এখনো দেখেন নি তবে।

—বুঝলেন কি ক'রে ?

—দেখলে আর ভুলতে পারতেন না। অবিনাশ ছবি তোলে ভালো।

তারপরে এলেন গণেশ বাবু, ভারি দেহ ও হাল্কা মন নিয়ে।

—বসুন, বসুন, অবিনাশ আসছে, পথে দেখা হ'য়েছিল।

—ওঃ।

মনের ভাবটা এই যে দেখা হয়েছিল যদি তবে গেল কোন চুলোয়।

—ছবিটা হয়েছে।

—দেখি দেখি।

আমি নীরব।

—দাঁড়ান, এত তাড়া কিসের?

এই বলে ধীরে সুস্থে সে একটা মোড়ক খুলতে লাগলো।

অবিনাশটা একেবারেই আনাড়ি, আমি হলে একটানে মোড়কের বাঁধন খুলতে পারি।

তারপরে ছবির উপর থেকে একখানা পাৎলা কাগজ খুলে ফেল্‌লো, সূর্য্যের উপর থেকে যেন কুয়াশা সরে গেল, সকলে সমস্বরে চীৎকার ক'রে, উঠ্‌ল—ওয়াণ্ডারফুল!

মাষ্টার মশাই বললেন, বয়স কুড়ি বৎসর কমে গিয়েছে।

গণেশ বাবু বল্‌লেন, ঠোঁট দুটো যেন নড়ছে, এখনি কথা ক'য়ে উঠ্‌বে।

মন্মথ বাবু বল্‌লেন, কপালের লাইনগুলো দেখেছেন—গুণে নেওয়া যায়।

অবিনাশ শুধালো—কেমন হ'য়েছে?

—হাঁ, মন্দ হয়'নি, তবে এরা যেমন বলছে তেমন কিছুই নয়।

—নিন কপিখানা।

—আবার ঘরের আবর্জ্জনা বাড়ানো, তা তুমি যখন শখ ক'রে তুলেছো, না নিলে আবার কি মনে করবে! দাও।

ছবিখানা কাগজে মুড়ে বগলদাবা ক'রে বেরিয়ে পড়লাম, কি জানি আবার কোন্ ভক্ত এসে অবিনাশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়!

নাঃ মাষ্টার মশায়ের সত্যি রসজ্ঞান আছে, বয়স কুড়ি ন' হোক পনেরো বছর যে ক'মে গিয়েছে তাতে আর ভুল নেই। জিতা রহো অবিনাশ।

৩

আমি একজন খ্যাতনামা গ্রন্থকার। এখন বিনয় না ক'রেও বলা যায় যে বাংলা দেশে এক ডাকে আমাকে চেনে। এমন অবস্থায় কিছু কিছু ভক্ত

জুটবেই, বিশেষ গৃহে যখন গৃহিণী নেই। ভক্ত মেয়েও অল্প জোটেনি, কিন্তু মাথায় পাকা চুল ও কপালে কুঞ্চিত রেখা দৃশ্যমান হ'বার পরে থেকে তাদের সংখ্যা দ্রুত ক'মে আসছে। দু'চার জন এখনো আছে। আমি জানি তাদের ভক্তি নিরেট, বয়সাতীত রসমূর্ত্তিকে তারা দেখ্‌তে পেয়েছে।

আমার ভক্তরা কানাকানি করে, বলে যে আজও ওঁর পঞ্চাশ পূরলো না নতুবা ধুমধাম ক'রে জন্মোৎসব করতাম।

আমি শুনে মনে মনে বলি—কেন পঞ্চাশের আগে কি জন্মদিন পড়ে না? যত সব—

একদিন তো একজন স্পষ্ট ক'রেই জিজ্ঞাসা করলো, সার, আপনার বয়স কত হ'ল?

সর্ব্বনাশ! সঙ্গে যে জন দুই মেয়ে ভক্তও আছে কিন্তু সহায় হ'ল উচ্চাঙ্গের ফিলজফি!

বললাম—ঐ বিদেশী মোহে তোমরাও পড়লে! এদেশের প্রাচীন কালের মহাপুরুষদের কথা একবার ভেবে দেখো দেখি, কার কবে জন্মোৎসব হয়েছে। এ সবের তাঁরা বিরোধী ছিলেন, কার কবে জন্ম, কার কত বয়স—ওতে অহমিকার প্রশ্রয় দেওয়া হয়! সেইজন্যই তাঁরা গোড়া ঘেঁষে কোপ মেরেছিলেন, ইতিহাস লিখবার পদ্ধতিটাই বর্জ্জন ক'রেছিলেন।

ভক্তদের একটা গুণ এই যে অনেক দুরূহ কথা তারা অত্যন্ত সহজে বোঝে! ওরা বুঝ্‌লো যে জন্মোৎসবে আমার আশক্তি নেই, তবে বয়সের অঙ্কটা গোপন রাখতে চাই একথা বুঝলো কিনা জানিনে!

যাক্‌ এ সব অবান্তর।

ছবিখানা দাঁড়িয়ে থেকে বাঁধিয়ে নিয়ে এসে বসবার ঘরে টাঙালাম!

সন্ধ্যার পরে এলো কৃষ্ণা। আমার মেয়ে ভক্তের কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রে সে হচ্ছে গিয়ে শেষতম কলাটি! এর পরেই অন্ধকার। খুব সম্ভব ও এখনো

আবিষ্কার করে নি যে আমার চুলের অনেকটা অংশই শাদা হয়ে উঠেছে। তাব সেটা ভক্তিব আতিশয্যে না পুরু কাঁচের চশমার কৃপায় ঠিক জানিনে।

কৃষ্ণা ছবিখানা দেখে উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠল বল্‌ল, এতদিন ছবি-খানা ছিল কোথায়? এ বুঝি আপনার যৌবন কালের ছবি! চমৎকার! তখন কি সুন্দরই না ছিল আপনার চেহারা!

হায় চশমার পুরু কাঁচ, তোমার উপরে বৃথাই ভরসা করেছিলাম।

—কেন, এখনকার ছবি হতে আপত্তি কি!

কৃষ্ণা সলজ্জ হেসে বল্‌ল, কি যে বলেন! দুয়ে যে বিশ বছরের তফাৎ।

—কৃষ্ণা, ওটা কাল তোলা হ'য়েছে।

ভক্ত তো আর ভক্তির পাত্রকে অবিশ্বাস করতে পারে না, তাই উচ্চাঙ্গের পরিহাস মনে করে হেসে উঠল।

বল্‌ল—এ ছবির একখানা কপি চাই, আপনার যে সব আধুনিক ছবি আমার কাছে আছে সেগুলো বিদায় ক'রে দেবো।

—কেন?

– তাতে আপনার বয়সের ছাপ আছে। আমি চাই আপনার বয়সাতীত কৈশোরের স্নিগ্ধ মূর্ত্তিটিকে! সেই তো হবে আপনার 'সিম্বল।'

মাষ্টার মশাই মিথ্যা বলেছিলেন, এখন কৃষ্ণার কথায় মনে হচ্ছে, বয়স বছর তিরিশ কমেছে! অবিনাশটা বাস্কেল!

কৃষ্ণা বিদায় হলে, তার দেওয়া ফুলগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম; রাতে কি খাবো জিজ্ঞাসা করতে এসে চাকরটা বকুনি খেলো; আর তার পরে ছবিখানা খুলে নিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেল্‌লাম! ওর স্মৃতিটাও যদি মুছে ফেল্‌তে পারতাম!

প্রতিকার চিন্তায় সারা রাত্রি বিনিদ্র কেটে গেলো।

৪

পরদিন সকালেই হন হন করে চললাম বড় রাস্তার মোড়ের দিকে।

পুরানো বন্ধু রমেন দেখে বল্‌ল—এত সকালে কোথায় চল্‌লে হে।

—ঐ মোড়ের দোকানে ছবি তুল্‌তে।

—তুমি কি পাগল হ'লে নাকি? ওখানে আনাড়ির হাতে তুলবে ছবি? কেন, অবিনাশ কি অপরাধ করেছে?

কোন উত্তর না দিয়ে চলে এলাম। এক টাকায় আটখানা দরের ছবি তুলিয়ে ডবল চার্জ দিয়ে তার মধ্যে একখানা এনলার্জ করিয়ে নিয়ে তবে একেবারে বাড়ী ফিরলাম। সেখানাকে টাঙিয়ে দিলাম আগের দিনের শূন্য ছবির জায়গায়! বাস! এবারে আসুক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণার দল!

সন্ধ্যার পরে যথা সময়ে কৃষ্ণা এলো। ছবির দিকে তাকিয়ে ভয়ে ক্রোধে বিরক্তিতে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—বল্‌ল, এ সর্ব্বনাশ করলো কে! তারপরে একটু থেমে হেসে বল্‌ল, আমিই ভুল করেছিলাম! এখানা নিশ্চয় আপনার পিতার ছবি।

—পিতার? কেন?

—বুড়ো কিনা তাই!

—কৃষ্ণা তুমি ভুল করছো, ওখানা আমারই ছবি!

—আপনার! মিথ্যা কথা! ঐ বুড়ো কি আপনি! বয়স যে কুড়ি বছর বাড়িয়ে দিয়েছে! কি সর্ব্বনাশ!

—ওখানা আজ সকালে তোলা।

—এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করিনে। যে-ছবি আপনাকে বুড়ো বানিয়ে দেয় তার সর্ব্বৈব মিথ্যা। ও ছবি আমি ঘরে থাকতে দেবোনা।

বলে' সে ছবিখানা খুলে নিয়ে ভেঙে ফেলে আর কি!

—করো কি, করো কি, বলে ছবিখানা তার হাতে থেকে কেড়ে নিয়ে দোতালায় শোবার ঘরে এসে খিল লাগিয়ে দিলাম। কৃষ্ণা কি করলে জানিনা।

তারপরে সেই ছবিখানা বুকে জড়িয়ে নিয়ে ঘরময় নৃত্য ক'রে বেড়ালাম, বললাম, অক্ষয় হয়ে থাকো আমার অনাগত বার্দ্ধক্য, অক্ষয় হয়ে থাকো আমার গৃহে! তোমারই তুলনামূলক পক্ষপাতে আমি আবার তরুণ!

ছবিখানা সোনালী ফ্রেমে বাঁধিয়ে বসবার ঘরে রেখে দিলাম। যে দেখে সে-ই বলে—ইস্, কোন্ আনাড়ি আপনাকে একেবারে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে। বলে— ওর তুলনায় কিন্তু আপনার বয়স অনেক কম।

আমি উচ্চাঙ্গের হাস্য ক'রে বলি—কম আর বেশি। ওসব থাক্!

মনে মনে বলি, বেঁচে থাক্ আমার আনাড়ি ফটোগ্রাফার। অক্ষয় হোক তার ক্যামেরা। অবিনাশটা রাস্কেল, কি বিপদেই না ফেলেছিল আমাকে।

# ব্ল্যাকমেল

গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ এবং বিপত্নীক। দুর্ম্মুখ এবং রগচটা এবং গ্রামের জমিদারের গোমস্তা।

একদিন চৈত্রমাসের দুপুর বেলা জমিদারের কাছারী হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল যে, যে-ঠিকা ঝি আসিয়া ঘর দোর সাফ করিয়া উনুন ধরাইয়া দিয়া যায় সে আসে নাই। সকাল বেলায় নিজে কলসীতে যে জল তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল একটি বায়স তাহার মুখের ঢাকনীটা ফেলিয়া দিয়া বসিয়া স্বচ্ছন্দে জলপান করিতেছে। সে কাকটাকে তাড়াইয়া মারিতে গেলে কাকটা উড়িয়া পালাইল, গোবর্দ্ধন কলসীর উপরে গিয়া পড়িল, মাটির কলসী উলটিয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, এবং কানায় লাগিয়া গোবর্দ্ধনের পা কাটিয়া গেল। সে দূরগত পাখীটার উদ্দেশ্যে যে-সব বিশেষণ প্রয়োগ করিল তাহা পাখীর উদ্দেশ্যে কখনো ব্যবহৃত হয়না, মানুষের উদ্দেশ্যেও কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গোবর্দ্ধন উনুন ধরাইতে বসিল, উনুন ধরিল না, তবে আগুনে হাতটা পুড়িয়া গেল। আর যখন সে হাতের সেবায় নিযুক্ত সেই সময়ে উনুনের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার ঘরখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া

গেল। গোবৰ্দ্ধন মুহূর্ত্তকাল স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল- আজ শালাকে দেখে নেবো। এই বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

গোবৰ্দ্ধন কিছুক্ষণ পরেই স্বর্গের দরজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া দারোয়ানজী বলিল, এই ঢুকো মৎ।

গোবৰ্দ্ধন বলিল, তোমার মৎ ফৎ রাখো, অমন অনেক শালার দারোয়ান চাপরাশি দেখেছি, আজ খাস মনিবকে দেখে নেবো। এই বলিয়া সে ঢুকিয়া পড়িল। দারোয়ান বলিল—বড়ি তাজ্জব কি বাৎ! তারপরে খানিকটা খৈনি যথাবিধি তৈয়ারি করিয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় সুখে ঢুলিতে লাগিল।

স্বর্গে প্রবেশ আদৌ কঠিন নয়, কেবল কিঞ্চিৎ সাহস ও দুর্ব্বাক্যের আবশ্যক।

গোবৰ্দ্ধনকে স্বর্গে প্রবিষ্ট দেখিয়া ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল—এবং শুধাইল—তুমি কে!

গোবৰ্দ্ধন বলিল—আমার পরিচয়ে তোমাদের দরকারটা কি শুনি!

দেবতারা বলিল- অন্ততঃ আমাদের পরিচয়টা লও।

গোবৰ্দ্ধন বলিল—যাত্রাগানের কৃপায় তোমাদেব পবিচয আমার বেশ জানা আছে—ঐ পাঁচমুণ্ড বেটাতো মহাদেব।

মহাদেব ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল।

ব্রহ্মা বলিল, তোমার প্রযোজন কি?

গোবৰ্দ্ধন বলিল—সেই শালাকে আজ দেখিয়া লইব।

কে সেই সৌভাগ্যবান দেবতারা বুঝিতে পারে নাই দেখিয়া গোবৰ্দ্ধন বলিল—তোমাদের দিযে আমার কাজ হইবে না, আমি তোমাদের নাটের গুরু সেই খোদ ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই।

তারপরে শুধাইল—ভালো চাও তো বলো বেটা কোথায় আছে।

গোবর্দ্ধনের তত্ত্বজিজ্ঞাসায় হতবুদ্ধি দেবগণ মাটিতে বসিয়া পড়িল।

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে দেবগণ ইতিপূর্ব্বে কখনো জমিদারের জীবন্ত গোমস্তার পাল্লায় পড়ে নাই।

বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে পলিটিশিয়ান অর্থাৎ যখন যেমন তখন তেমন ব্যবহার করিতে পারে। সে বলিল, এতো উত্তম কথা। আপনি এখন স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করুন, তারপরে ভগবানের সঙ্গে দেখা করিবেন, এখন তিনি নিদ্রিত।

গোবর্দ্ধন বলিল—বেটা না ঘুমোলে আর আমার এমন দশা হয়।

যাই হোক দেবতাগণের তোষণে গোবর্দ্ধন স্নানাহার সম্পন্ন করিলে বিষ্ণু বলিল,—আপনি একটু ঘুমোন, ভগবান জাগিলে আপনাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইব।

'সেই ভালো' বলিয়া গোবর্দ্ধন শয়ন করিল এবং চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন ব্রাহ্মণকে নিদ্রিত মনে করিয়া দেবগণ অদূরে বসিয়া কথোপকথন সুরু করিল।

ব্রহ্মা বলিল—আজ সেরেছে। এই বুড়ো বামনাকে সামাল দেওয়া সহজ হবে না; মহাদেব বলিল, বেটার যে রাগ, তাতে আবার আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে—আমি ওর মধ্যে নাই। ইন্দ্র বলিল—বেটা যদি আমাদের ফাঁকি ধরিয়া ফেলে- আর পৃথিবীতে ফিরিয়া গিয়া সব রটাইয়া দেয়, তবেই আমাদের দেবত্ব গেল—আর কেহ কি মানিবে?

ব্রহ্মা শুধাইল—এখন কর্ত্তব্য স্থির করো।

বিষ্ণু বলিল—পলিটিক্স করিতে গেলে মাঝে মাঝে এমন বিপদ অনিবার্য্য —তাই বলিয়া ঘাবড়াইলে চলিবে কেন?

ব্রহ্মা বলিল—ঘাবড়ানোর কথা নয়, কিন্তু যাহা নাই তাহা আছে বলিয়া প্রমাণ করি কিরূপে?

ইন্দ্র বলিল—এ কথা স্বরূপ। ভগবান বলিয়া কেহ নাই, অথচ আমরা সকলে মিলিয়া ঐ ধাপ্পা দিয়া জগৎ সংসার চালাইতেছি। ঐ ধাপ্পায় এতকাল বেশ চলিয়াছে কিন্তু আজ দেখিতেছি সমূহ বিপদ।

চন্দ্র বলিল—যাহার যখনি বিপদ হইয়াছে আমরা বলিয়া দিয়াছি, ভগবানের ইচ্ছা। লোকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়াছে।

বায়ু বলিল—আবার যখনি যাহার সম্পদ হইয়াছে, আমরা বলিয়া দিয়াছি, ভগবানের ইচ্ছা। লোকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কখনো ভগবানকে দেখিতে চাহে নাই।

ব্রহ্মা বলিল—আর চাহিলেও বলিয়াছি যে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, এমনকি 'অপ্রাপ্য মনসা সহ'। লোকে ইহাকে উচ্চাঙ্গের ফিলজফি বলিয়া গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে।

বিষ্ণু বলিল—এমন ছেলেমানুষি আজ ধরা পড়িবার মুখে বলিয়া সন্ত্রস্ত না হইয়া এতদিন যে চালু ছিল তাহার জন্য নিজেদের অভিনন্দিত করা আবশ্যক।

তারপরে একটু থামিয়া বিষ্ণু বলিল—আচ্ছা, কাহাকেও ভগবান্ সাজাইয়া দেখাইয়া দিলে কেমন হয়? কোন কথা বলিতে হইবে না, কেবল গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেই চলিবে! —আচ্ছা মহাদেব, তুমি ভগবান সাজো না কেন?

মহাদেব বলিল—ভাই, আমি তো আগেই বলিয়া দিয়াছি যে আমি ওর মধ্যে নাই। বামনা বিষম রাগী—হঠাৎ যদি assault করিয়া বসে!

বিষ্ণু বলিল তাহাতে তোমার প্রাণ যাইবে না, কিন্তু ধাপ্পা একেবারে ফাঁস হইয়া গেলে সকলেরই দেবত্ব যে যাইবে!

—যায় যাক্! বলিয়া মহাদেব শুইয়া পড়িল।

বিষ্ণু বলিল—তাহলে এক কাজ করো। বামন টাকাকড়ি যা চায় দিয়া খুশী করিয়া ফিরিয়া পাঠাও, তবে সবদিক্ রক্ষা পায়।

ব্রহ্মা বলিল—বেটা যদি মোক্ষ চায় ?

বিষ্ণু বলিল—ভায়া, তুমি কি পাগল হইয়াছ ? মোক্ষ কামনায় কেহ কি ভর দুপুরবেলা অস্নাত অভুক্ত স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হয় ! ও ভয় করিও না।

—আর তাছাড়া মোক্ষও তো আমাদেরই রচিত সুচতুর ধাপ্পা যে পায় নাই তাহার কথা ও বিষয়ে গ্রাহ্য নয়, আর যে পাইয়াছে সে কখনো বলিতে আসে না ! কি কৌশল ! বাবা, বিশ্বচালনা কি সহজ ? কত মাথা খাটাইতে হয় !

—কিন্তু আজকার সমস্যার সমাধান কি ? বুড়ো বামনাকে ঠেকাবার কি উপায় ?

এমন সময়ে গোবর্দ্ধন সোজা উঠিয়া বসিল।

ব্রহ্মা শুধাল—আপনার ঘুম হইল ?

গোবর্দ্ধন বলিল—ঘুম হোক না হোক, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তোমাদের ধাপ্পা সম্যক্ অবগত হইয়াছি। তোমরা কয়েকজনে মিলিয়া বেশ জোচ্চোরী কারবার খুলিয়াছ আর কি ! ইহার কাছে কোথায় লাগে লিমিটেড কোম্পানীর ব্যবসা !

ব্রহ্মা বলিল—ঘুমের মধ্যে কি শুনিতে কি শুনিয়াছেন !

গোবর্দ্ধন বলিল—বেশ তাই ভালো। আমি পৃথিবীতে গিয়া সব ফাঁস করিয়া দিতেছি।

বিষ্ণু বলিল—আপনি শুনিয়াছেন ঠিকই, তবে অর্থবোধ হয় নাই, আমরা পরিহাস করিতেছিলাম, দেখিতেছিলাম আপনি বুঝিতে পারেন কি না।

গোবর্দ্ধন বলিল—আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি ভাবিয়াই মন খুলিয়া কথা বলিয়াছ অথচ আমি আদৌ ঘুমাই নাই, কাজেই বোঝা যাইতেছে যে অন্যান্য গুণের মতোই অন্তর্য্যামী গুণটা একটা অলীক বস্তু ! আজ পৃথিবীতে ফিরিয়া গিয়া তোমাদের তাসের কেল্লা ভাঙিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

মহাদেব বলিল—নাও, আমি আগেই বলিয়াছিলাম, বামনা সহজ পাত্র নয়।

বিষ্ণু বলিল—ঠাকুর, তুমি কি চাও বলো দেখি ?

গোবর্দ্ধন বলিল—আমি যখন যা চাই দিতে পারবে ?

বিষ্ণু বলিল ইহাকে যে Blackmail করা বলে।

ব্রাহ্মণ বলিল—আর তোমরা যে আদিকাল হইতে মানুষকে Blackmail করিয়া আসিতেছ তাহার কি হয় ? 'ভগবান আছে' 'ভগবান আছে', বলিয়া কি কম ভোগা দিয়াছ। আজ দেখিতেছি সব ফাঁকি। ইহার চেয়ে limited monarchyর রাজাও অনেক সত্য! কাজেই Blackmail করিবার কথাটা আর নাই তুলিলে!

বিষ্ণু বলিল—তথাস্তু। যখন যা চাহিবে তাহাই পাইবে।

ব্রাহ্মণ জমিদারের গোমস্তা! সে বলিল—মাইরি, তোমাদের কথায় যে বিশ্বাস করে সে—

বিষ্ণু বলিল, থাক্, থাক্, আর খুলিয়া বলিতে হইবে না, বুঝিতে পারিয়াছি। এখনই নগদ কিছু চাও, এইতো ? কি চাও ?

ব্রাহ্মণ সুদীর্ঘ এক ফর্দ্দ ফেলিয়া দিল। দেবগণ চাঁদা তুলিয়া ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূরণ করিল।

গোবর্দ্ধন হাতীঘোড়া, সোনাদানা ও অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া মর্ত্তে ফিরিয়া আসিল।

তারপরে তাহার যখনই যাহা প্রয়োজন হইত, চাহিত। দেবগণ ইতস্তত: করিলে গোবর্দ্ধন সমস্ত ফাঁস করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া দেবতাদের Blackmail করিত। দেবগণ অগত্যা তাহার প্রার্থনা পূরণ করিতে বাধ্য হইত।

কোন কোন ছোকরা-দেবতা আপত্তি করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি ঝানু দেবতাগণ তাহাদের বুঝাইত, বাপু, ইহাতে আপত্তি করিলে চলিবে কেন ? আমরা যে-ভাবে মানুষকে Blackmail করিয়া আসিতেছি, তাহার তুলনায় বামুনের দাবী তো অকিঞ্চিৎকর। বিশেষ তাহার দাবীতে অসম্মত

হইলে তোমাদের দেবত্ব থাকিবে কোথায়? তখন যে না খাইয়া মরিবে? খাটিয়া খাইবে তাহার উপায় নাই, কেন না তোমরা Trade Union-এর মেম্বার নও, এমন কি কেহ তোমাদের দিন-মজুর রূপেও রাখিবে না, কেন না তোমরা যে বুর্জোয়া একথা সুপরিজ্ঞাত। অতএব বৎসগণ, বেশি ট্যাফুঁ করিও না, ব্রাহ্মণ যখন যাহা চায় দিয়া যাও, তাহাতে দেবত্ব ও রাজত্ব দুই-ই থাকিবে, নতুবা—

চ্যাঙড়া দেবতাগণ বলিত, বুঝিয়াছি, আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

# তিমিঙ্গিল

আর কিছুই নয়, শুধু একখানি পত্র পাইয়াছি, পোষ্টকার্ডের খোলা পত্র, এবং সেই হইতে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছি। আমার ভাবনা চিন্তার দ্বারা অনেকক্ষণ হইল সমাধানহীনতার অকূল সিন্ধুতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কাজেই চিন্তা করিবারও আর কিছু নাই, কেবল মাথা ঘুরিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছি যে পৃথিবীও ঘূর্ণনশীল।

পণ্ডিতেরা বলেন যে মানুষের দুষ্কৃতি জন্মান্তর অতিক্রম করিয়াও দেখা দিয়া থাকে—একদিন না একদিন তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। সুকৃতিরও কি এই নিয়ম নাকি ? পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত নহেন। সুকৃতি কি আমার হিসাবে কিছুই জমা নাই, তবে তাহারা দেখা দেয় না কেন ? এ পর্য্যন্ত দেখা দিল না কেন ? পূর্ব্বতন দুষ্কৃতি তো মাঝে মাঝেই দেখা দিয়া থাকে—এবারে বেশ ঘটা করিয়া দেখা দিতে আসিয়াছে আর তাহারই পায়ের প্রতিধ্বনি ঘাত্রে আমাকে আড়াই ঘণ্টা হইল অকূল পাথারে নিক্ষেপ করিয়াছে।

পাঠক হয় তো ভাবিতেছেন যে আমার দুশ্চিন্তার বিষয় যেমন জটিল তেমনি পরমার্থিক। জটিল সন্দেহ নাই, কিন্তু পরমার্থিক নয়, তবে অর্থের পরিমাণ প্রচুর হইলে যদি পরমার্থিক বলা সঙ্গত হয় তবে অবশ্যই পরমার্থিক।

প্রায় দশ বছর আগে একজনের কাছে কিছু টাকা ঋণ করিয়াছিলাম, তারপরে সেটা আর শোধ করা হয় নাই, অর্থাৎ সে ব্যক্তি আর টাকা লইতে আসে নাই, নতুবা স্বেচ্ছায় আর কে কবে ঋণ শোধ করে? সেই ব্যক্তি এতদিনে আমার সন্ধান পাইয়া জানাইয়াছে যে কাল শুভ প্রাতে অর্থাৎ সাড়ে আটটার সময়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। টাকার জন্যই একথা লেখে নাই, কিন্তু না লিখিলেও যে-সব বিষয় বুঝিতে পারা যায় এটা তাহাদের অন্তর্গত! কিন্তু আমার ঠিকানা পাইল কিরূপে? ইতিমধ্যে অন্ততঃ দশ বার বাসস্থান বদলাইয়াছি, এমন কি দেশটাও বদলাইয়াছি, এবং পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। লোকটার গবেষণা শক্তি অসীম সন্দেহ নাই! প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেও চলে! আর এই দশ বছরের মধ্যে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মহামারী, নরহত্যা তো কম ঘটে নাই—অথচ লোকটা দিব্য টিকিয়া আছে। এত যে লক্ষ লক্ষ লোক মরিল সবই কি শুধু খবরের কাগজে নাকি? কিন্তু তাই বা বলি কি প্রকারে? আমার কাছেও দু'চারজন লোক ঋণী ছিল, তাহাদের তো আর দেখা পাই না। মরিতে কি তাহারাই মরিল নাকি? অর্থের ঋণ যদি দুশ্চিন্তায় শোধ হইত, তবে এই সার্দ্ধ দুই ঘণ্টাকালে যে-পরিমাণে চিন্তা করিয়াছি তাহাতে সুদে আসলে সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গিয়া হাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত।

পাঠকের কি অভিজ্ঞতা জানি না, অবাধ্য উত্তমর্ণের উপরে অধমর্ণের ক্রোধ সঞ্জাত হইয়া থাকে। আমারও হইল! মনে হইল লোকটার আক্কেল কি রকম! এ ঋণ হিটলার-মুসোলিনির আমলের। তাহারা তল গেল তবু সেই পুরাতন কাসুন্দির দাবী! যে-বৃটিশ ভারতে বসিয়া ঋণ করিয়াছিলাম সে বৃটিশও গিয়াছে আবার ভারতের আধাআধি গত—তবু তাহার দাবীটা যায় না! লোকটা কি নাছোড়বান্দা! Objective condition-এর সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে অক্ষম! এমন লোকের সাজা হওয়া উচিত! তখনি মনে হইল বিধাতা আমার হাতে দিয়া তাহাকে

দণ্ড দিবেন! ক্রমে বুঝিলাম যে আমিই বিধাতার হাকিম ও বেলিফ'! এই বোধ হইবামাত্র মনে পরম শান্তি পাইলাম।

তখন চাকরকে ডাকিয়া বলিলাম, কাল সকালে আমি খুব ব্যস্ত থাকিব, সাড়ে আটটা নাগাদ সময়ে কোন ব্যক্তি দেখা করিতে আসিলে বলিবে যে বাবু বাড়ী নাই।

—বাবুর চেহারা কেমন? হাঁ, এ প্রশ্ন সঙ্গত বটে! লম্বা হানো, ছিপছিপে, চুল পাকা এবং মাথায় টাক। দশ বৎসর আগে এ দুটি ছিল না কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া আমার দিব্যচক্ষু নির্দ্দেশ দিল!

চাকরটা বলিল—তাই হইবে।

পরদিন বেলা নয়টার সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, বাবুকে ভাগাইয়া দিয়াছি!

জিতা রহো! এই তো চাই।

—কি বলিল?

—কিছুই নয়, শুধু এই চিঠিখানি দিয়া গেল।

"অমলেশ বাবু, প্রায় দশ বছর আগে দেওঘরে আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম, শোধ করা হয়নি। দোষ অবশ্য হয়েছে, কিন্তু গত দশ বছর যে দশ যুগ, মানুষের দশ দশার প্রতীক। যাই হোক, অনেক দিনের চেষ্টায় আপনার সন্ধান পেয়ে শোধ করতে এসেছিলাম। শুনলাম আপনি বাড়ী নেই। বড়ই দুঃখিত। আবার পরে আসবো। ইতি—সিদ্ধিনাথ।

—ও বাবুকে তাড়ালি কেন?

—আজ্ঞে লম্বা হানো, ছিপছিপে, মাথাভরা টাক!

সিদ্ধিনাথের তো ওরকম চেহারা ছিল না!

পরে আসিবে? কতদিন পরে? আবার দশ বছর পার করিয়া নাকি!

দুঃখিত হইয়াছে কিন্তু আমার দুঃখের কি খোঁজ রাখে! চাকরকে বলিলাম, কোন বাবু আসিলে তাড়াইও না। দশ বৎসরে কার চেহারার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে কে জানে!

তবু সান্ত্বনা এই যে উত্তমর্ণ আসিল না! এ-ও কি সম্ভব? কেন নয়? দশ বছর আগেকার অধমর্ণ যদি ঋণ শোধ করিতে আসে তবে উত্তমর্ণ কথার খেলাপ করিবে তাহাতেই বা বিস্ময়ের কি?

সন্ধ্যাবেলায় উপরে বসিয়া আছি এমন সময়ে অন্য চাকরটি (আগের জন এখন সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত) বলিল—একজন বাবু এসেছেন।

—কি রকম চেহারা?

—আজ্ঞে, লম্বা, ছিপছিপে—

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই বলিলাম, বাস্ বাস্! বেঁচে থাকো সিদ্ধিনাথ, তুমি নবযুগের হরিশ্চন্দ্র!

ছুটিয়া নীচে গেলাম—ঘরে ঢুকিয়াই চমকিয়া উঠিলাম—এ যে বঙ্কুবিহারী, আমার উত্তমর্ণ!

—আপনার তো সকালে আসবার কথা ছিল। (যেন যথা সময়ে না আসা কত বড় অপরাধ! ভাবটা—ঐ অপরাধের জন্যই ঋণ পরিশোধ না করা উচিত!)

—বুঝলেন না, ঐটুকু 'পলিটিকস্' করতে হ'ল। অনেক দেনদার করে কি জানেন? পাওনাদারের আসবার সময় জানলে তখন আর বাড়ী থাকে না, সেইজন্য একটা সময় নির্দ্দেশ ক'রে আর এক সময়ে আসতে হয়।

লোকটা আমাকে শঠ ভাবিতেছে, এবারে রাগ করিলে অন্যায় হইবে না।

এমন সময়ে সে হাসিয়া বলিল—অবশ্য আপনি তেমন করবেন না জানতাম।

তবু রাগ করা উচিত! ইহাকে রীতিমতো ক্ষমা প্রার্থনা বলে না।

—অনেক দিনের টাকাটা, এবারে যদি দিয়ে ফেলেন!

এখন কি বলা উচিত তাই ভাবিতেছি, অবশ্য টাকা দেওয়ার কথা উঠিতে পারে না।

এমন সময়ে ঘরের আর এক দরজায় ও কে? সিদ্ধিনাথ যে!

—এসো, এসো ভাই!

সে যেন অকূল সমুদ্রে তৃণ খণ্ড! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বুঝিলাম তৃণ খণ্ড নয়, লাইফ বোট!

সিদ্ধিনাথকে দেখিবামাত্র বঙ্কুবিহারী এক লাফে চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া 'এখনি আসছি' বলিয়া অন্য দ্বারপথে সবেগে প্রস্থান করিল।

—ব্যাপার কি?

—সিদ্ধিনাথ বলিল—ও যে বঙ্কুবিহারী!

—তার মানে?

—যুদ্ধের সময়ে দু'জনে একসঙ্গে কিছুদিন ব্যবসা ক'রেছিলাম, ও ছিল 'পার্টনার', আমার কাছ থেকে এক দফায় দশ হাজার টাকা নিয়েছিল। তার পর এই প্রথম দেখা।

—এবং নিশ্চয় জেনো শেষ দেখা।

—মনে হচ্ছে তাই।

—পলায়নের ব্যস্ততা দেখেও বুঝলে না। আমি বলিলাম, সিদ্ধিনাথ ভাই, তুমি তিমিঙ্গিল।

—সে আবার কি?

—পরে ব্যাখ্যা করবো, এখন চা খাও। আপাততঃ এইটুকু জেনে রাখো যে তিমি ভয়ানক জন্তু, কিন্তু তিমিঙ্গিল তার চেয়েও ভয়ানক! তাই তিমিঙ্গিলকে দেখে তিমি ভয়ে পলায়ন করে।

তারপরে বঙ্কুবিহারী আর কখনো টাকা আদায়ের জন্য আমার বাড়ী আসে নাই। সিদ্ধিনাথের কাছে সামান্য টাকা পাইতাম, বঙ্কুবিহারীর কাছে আমার ঋণ অনেক বেশি। কিন্তু রহস্য এই যে সিদ্ধিনাথের কাছে আমার

পাওনা বঙ্কুবিহারীর কাছে প্রচুর দেনাকে অবাধে ঠেকাইয়া দিল। আমার ন্যায়তঃ ধর্মতঃ উচিত যে সিদ্ধিনাথের দেনাটা ছাড়িয়া দেওয়া, তাহাতেও আমার প্রচুর মুনাফা থাকিত। পাঠক আশ্বস্ত হইতে পারেন যে সিদ্ধিনাথের দেনা সব আদায় করিয়া লইয়াছি এক পয়সাও ছাড়ি নাই। তবে হাঁ, এক কাজ করিয়াছি। সিদ্ধিনাথের একখানা ছবি তুলিয়া বৈঠকখানায় টাঙাইয়া রাখিয়াছি। তিমিঙ্গিলের ছবিতে তিমির ভয় পাইবার কথা! ভবিষ্যৎ যদি আবার আক্রমণ করে!

# বাল্মীকির পুনর্জন্ম

আদি কবি বাল্মীকি একদিন আদি পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়া ডাকিলেন, পিতামহ! ব্রহ্মা বলিলেন—কি ব্যাপার?

বাল্মীকি বলিলেন—আর একবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার বাসনা—

—হঠাৎ এমন বেয়াড়া বাসনা হইতে গেল কেন?

বাল্মীকি বলিলেন—আমি আদি কবি। অনেককাল পৃথিবী ছাড়িয়াছি, সেখানে কাব্যের এখন কি অবস্থা জানিবার কৌতূহল হইয়াছে।

ব্রহ্মা বলিলেন—তা যাইবে যাও, কিন্তু তোমার চেহারা ও সাজপোষাক একটু যুগোচিত করিয়া যাইও, আর ফিরিয়া আসিয়া তোমার অভিজ্ঞতা জানাইতে ভুলিও না।

বাল্মীকি বলিলেন—যে আজ্ঞে, আপনার উপদেশ মনে থাকিবে। বাল্মীকি প্রস্থান করিলেন।

বাল্মীকির বর্তমান জন্মের নাম বনমালী। বনমালীবাবু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কারণ এখন মুখে গোঁফ ও খাতায় কবিতা দেখা দিতে সুরু করিয়াছে। পাড়ার সকলে এখন উদীয়মান কবি বনমালীবাবুর দিকে তাকাইয়া কানাকানি করে, বলে, বনমালীবাবুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। একদিন তিনি নিজ ভবিষ্যতের ঔজ্জ্বল্য

পরীক্ষা করিবার আশায় কবিতার খাতাখানি লইয়া প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা 'বসুন্ধরা' অফিসের দিকে গুটি গুটি চলিলেন।

অফিসে ঢুকিবামাত্র বনমালীর উৎসাহ ও সাহসে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ করিল। একি প্রসিদ্ধ সাহিত্য-পত্রের অফিস—স্বয়ং সরস্বতীর লীলাবিলাস ক্ষেত্র! মেঝে হইতে চাতাল পর্য্যন্ত বিচিত্র বর্ণের ও আকারের পুস্তকে ঠাসা, তাহার স্তরে স্তরে ধূলা জমিয়াছে। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, কিন্তু একেবারে নিরবচ্ছিন্ন ফাঁক নয়, জীর্ণ ও মলিন টেবিল চেয়ারে ভর্ত্তি। বনমালীর দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু নিরুপায়, ফিরিবার পথ বন্ধ, কারণ ইতিমধ্যে তাহার পিছনে একটি জনতা জমিয়া উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অনভিজ্ঞ বনমালী ভাবিল তাহারাও সাহিত্যযশঃপ্রার্থী। যদিচ বাংলাদেশে সাহিত্যিকের সংখ্যা অল্প নয়, তবু ঠিকাদারের সংখ্যার কাছে পারিবে কেন? তার উপরে বইয়ের বাজার খারাপ হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের অনেক ডিকেন্স, লরেন্স, হাকস্লি ও হোমার রাতারাতি ঠিকাদার-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। জনতার অনেকেই ভূতপূর্ব্ব সাহিত্যিক, বর্ত্তমানে ঠিকাদার, আর বাকি সকলে বর্ত্তমানে ঠিকাদার এবং বইয়ের বাজারে তেজি ঘটিলেই ইলিয়ট, স্পেণ্ডার, সোলুগব রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। 'বসুন্ধরা' পত্রিকার নূতন ইমারৎ প্রস্তুত হইবে—জনতা তাহারই ঠিকাদারি পাইবার উমেদার।

পিছনে হটিবার উপায় না থাকায় পিছনের ধাক্কার বেগে বনমালী সম্মুখে চালিত হইয়া যেখানে থামিল সেখানে সোডার বোতলের মুখ রুদ্ধ করিয়া যেমন একটি গুলি থাকে, তেমনি একটি নরপুঙ্গব বিরাজমান।

সে বনমালীর মুখে গবাক্ষ দুটি স্থাপন করিয়া বলিল—কি! পাঠক, বাংলা স্বরবর্ণে এমন স্বর নাই যদ্বারা ঐ ধ্বনি প্রকাশ করা যায়—তবে তাহার নিকটতম স্বর 'ই' বলিয়াই 'কি' লিখিলাম! সে স্বর যেমন উদাত্ত তেমনি গম্ভীর। বৃকোদর ভোজনান্তে উদ্গার তুলিলে অনেকটা ঐরূপ শ্রুত হয়।

ভূতপূর্ব্ব রত্নাকর বনমালীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু কিছু না বলিলে চলে না, তাই তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—কবিতা!

নরপুঙ্গব প্রত্যুত্তর করিল না, পাশের আর এক নরপুঙ্গবের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল।

পিছনের জনতা ঠেলিতেছে, বলিতেছে সরুন, সরুন, এখন কাজের সময় ওসব ছেলেখেলা রাখুন।

জনতা জানিয়া ফেলিয়াছে পূর্ব্ববর্ত্তী ঠিকাদার নয় কবি।

বনমালীর ঠোঁট নড়িল, কিন্তু বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বেই পশ্চাতের ধাক্কায় বনমালী কক্ষের একান্তে গিয়া পড়িল। জীবনে মহৎ সুযোগ দুইবার আসে না। বনমালী তাহার চরম সুযোগ হারাইয়াছে। 'বনমালী হ্যাজ মিস্‌ড দি বাস।'

বনমালীর যখন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, দেখিতে পাইল যে পঞ্চমুণ্ডীর উপরে যেমন সাধক তেমনি সে একরাশ টীকা, গুল, তামাক ও হুকো-কল্কের উপরে উপবিষ্ট। আরও অদূরে দেখিল একটি বৃদ্ধ কৃশকায় লোকের কৌতূহলী চক্ষু তাহার দিকে নিবদ্ধ।

লোকটি বলিল—কি বাবা, কবিতা এনেছিলে বুঝি।

বিস্মিত বনমালী বলিল, বুঝলে কি করে?

কৃশকায় হাসিয়া বলিল—প্রতিদিনই কত লোককে এখানে ছিটকে এসে পড়তে দেখি,—তারা সবাই কবি।

তারপরে সে আপন মনে বলিয়া চলিল, আমার এখানে গড়াগড়ি না দিয়ে কোন কবি নাম করতে পারেনি। আমি বড়বাবুর হুকোবর্দ্দার কিনা?

একটু থামিয়া—এক ছিলিম খাবে নাকি?

—না, আমার সিগারেট আছে।

একটি বৃদ্ধের দিকে আগাইয়া দিয়া বনমালী অপরটি ধরাইল।

বৃদ্ধ বলিল, কবিতা লেখো? তবে কবিতা শোনো।

এই বলিয়া সুর করিয়া সে কৃত্তিবাসী রামায়ণের খানিকটা আবৃত্তি করিল বলিল—কেমন ?

কৃত্তিবাস, লিপিকার ও মুদ্রাকরগণের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও বনমালী বুঝিল যে ওটা মূল রামায়ণের কাহিনী, তাই সে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির গৌরবে বলিল—ওরকম আমিও লিখতে পারি।

বৃদ্ধ এই অর্ব্বাচীন উক্তির উত্তর দেওয়া উচিত মনে করিল না, বলিল, নেশা খুব জমেছে বটে! সিগ্রেটেই এত!

তারপরে বলিল—শোন বাবা, যদি লেখা ছাপতে চাও কবিতা ছাড়ো! গল্প লেখো, ভালো ভালো কেচ্ছা।

বিমূঢ় বনমালী বাহির হইয়া পড়িল। তাহার মনে পড়িল বসুন্ধরার সেই নরপুঙ্গবের ব্যবহার! বৃদ্ধের কথাই হয়তো সত্য। বনমালার সঙ্গে আরও দুইজন লেখক উপস্থিত হইয়াছিল, একজন প্রবন্ধকার, একজন গল্প-লেখক। লোকটি বনমালীর দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই, কিন্তু প্রবন্ধকারকে বসিতে বলিয়াছিল আর গল্প-লেখককে শুধু বসিতে বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—একটি পান খাইতেও দিয়াছিল। এখন সেইসব কথা মনে পড়ায় বুঝিল বৃদ্ধের উপদেশই সত্য, বুঝিল যে এখন গল্প-লেখকেরই সব চেয়ে আদর! বনমালী স্থির করিল তৎপর গল্প লিখিতে আরম্ভ করিবে। বনমালা ভাবিল সবই বুঝিয়াছে—কিন্তু বস্তুতঃ সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই, ত্রেতাযুগে আর কলিযুগে প্রভেদ যে অনেক!

২

এবারে বনমালী একটি গল্প লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু সংস্কার বুদ্ধির চেয়ে প্রবলতর বলিয়া গল্পটি হইল রামসীতার কাহিনী। গল্পটি লইয়া সে পুনরায় বসুন্ধরা পত্রিকার অফিসের দিকে চলিল। অফিসের দরজায় পৌঁছিয়াই সেই বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। বৃদ্ধের নাম রামকান্ত।

রামকান্ত হাসিয়া বলিল—কি বাবা, এবারো তো গল্প আননি!

বনমালী বলিল—না, এবারে গল্প।

রামকান্ত বলিল—বেশ করেছ, আমার হাতে দাও।

—কেন, একেবারে বাবুকে দিই না কেন?

—আরে রাম, বাবুর কি ওসব দেখবার সময় আছে?

—তবে বাবু কি দেখেন?

—বাবু বিজ্ঞাপন দেখেন। ওসব বাছাই করবার ভার আমার উপর।

—তোমার উপরে?

—কেন বাবা, অবাক হচ্ছ কেন? বিজ্ঞাপনেই তো মাল, ওতেই তো বুদ্ধির দরকার।

—আর সাহিত্যে বুঝি বুদ্ধির দরকার নেই?

—সাহিত্যিকেরা ভাবে দরকার আছে। আরে এটা বোঝো না, যারা আর কিছু করতে পারে না তারাই সাহিত্য করে।

সে আরও বলিল—বিজ্ঞাপনে টাকা আসে, সাহিত্যের জন্য টাকা দিতে হয়—এখন তুমিই বলো দাম কোন্‌টার বেশি!

তারপরে হাসিয়া বলিল—একটা লক্ষ্মী, আর একটা সরস্বতী।

হাসিবার সময়ে তাহার সোনাবাঁধা দন্তপঙ্‌ক্তি বাহির হইয়া পড়িল।

রামকান্ত বলিল—আমি বাবুর খাস খানসামা, আমার দাঁতে যেটুকু সোনা আছে, ক'টা সাহিত্যিকের ঘরে সেই সোনাটুকু আছে বলো?

বনমালী শুধাইল—তবে সাহিত্য ছাপা কেন? শুধু বিজ্ঞাপন ছাপলেই হয়?

—তা হয় না। ফুলের তোড়া বাঁধতে কয়েকটা পাতার দরকার হয়, সাহিত্য সেই পাতা।

একটু থামিয়া বলিল—এসব ক্রমে বুঝিবে। দাও কি এনেছ।

এই বলিয়া বনমালীর হাত হইতে গল্পটি চাহিয়া লইল।

বলিল—যাও, এবার বাড়ী যাও, তোমার নাম ছাপা হয়ে যাবে, চিন্তা করো না।

বনমালী দেখিল, সত্যই তাহার গল্পটি যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সেটি আর পূর্ব্বের কাহিনী নাই, সীতাবাই নামে এক চলচ্চিত্র নটীর পুণ্য জীবন-কথায় পরিণত হইয়াছে। কেন এ পরিবর্ত্তন সে বুঝিতে পারিল না। পারিবে কেমন করিয়া—ত্রেতাযুগে আর কালযুগে অনেক প্রভেদ!

রামকান্তের হস্তক্ষেপের ফলে নিয়মিতভাবে বনমালীর গল্প বসুন্ধরা পত্রে বাহির হইতে লাগিল, এবং বসুন্ধরা কাগজের নজিরে অন্যান্য পত্রাদিতেও তাহার গল্প প্রকাশিত হইল। ক্রমে রামকান্তর ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া কবি বনমালী কথাসাহিত্যিক বনমালীরূপে পরিচিত হইল। যাহারা আরও আধুনিক তারা বলে গাল্পিক বনমালী।

গল্পগুলির মূল্যস্বরূপ তাহার যে সুপ্রচুর অর্থাগম হইত, তাহাতে বনমালীর নস্য কেনার সঙ্গতি হইল, এইভাবে তাহার খ্যাতি বাড়িতে থাকিলে বছর দশেক পরে রচনার মূল্যেই সিগারেট, টুথপেষ্ট প্রভৃতি কিনিতে সমর্থ হইবে।

৩

একদিন সকালবেলায় বনমালী ঘরে বসিয়া আছে—এমন সময়ে রামকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইল।

বনমালী শুধাইল—এত সকালেই, ব্যাপার কি?

রামকান্ত বলিল, খুব জরুরী। রবিবারে এক বিরাট সাহিত্যসভা আছে, তাতে তোমার নিমন্ত্রণ জোগাড করে এনেছি।

এই বলিয়া খাস্তা লুচির মতো মর্ম্মরিত একখানি প্রশস্ত পত্র তাহার হাতে দিল।

এ সৌভাগ্য বনমালীর কল্পনাতীত। পত্রখানি হাতে লইয়া সে মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল—রামকান্তকে বিড়ি অফার করিতেও ভুলিয়া গেল।

রামকান্ত তাহার বিস্ময় দেখিয়া বলিল—এখনই কি হয়েছে—আর কিছুদিন পরে তোমাকে একটা শাখার সভাপতি করে দিতে পারবো—অন্ততঃ

প্রধান অতিথি করে দিতে পারবো—তার সন্দেহ নেই। গাল্পিক বনমালী এখন শাখা সভাপতি ও প্রধান অতিথি প্রভৃতি পরিভাষার অর্থ বুঝিতে শিখিয়াছে।

কৃতজ্ঞ ও পুলকিত বনমালী বলিল—রামকান্তদা (লোকটাকে এখন সে দাদা বলে, সাহিত্য বলো, রাজনীতি বলো দাদাকরণ ছাড়া গত্যন্তর নাই), তাহলে আমাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেও।

রামকান্ত বলিল যাবো বই কি। আমি না নিয়ে গেলে তুমি সেখানে ঢুকতে পাবে কেন?

তাহাই স্থির হইল। যথা সময়ে রামকান্তের সঙ্গে বনমালী সাহিত্য সভায় যাইবে।

৪

যথাদিনে রামকান্ত সমভিব্যাহারে বনমালী সাহিত্য-সভায় উপস্থিত হইল। সাহিত্য-সভার বর্ণনা আমি কি প্রকারে দিব? যেমনটি দরকার, যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি হইয়াছে। এক কথায় সেখানে সাহিত্য ও সাহিত্যিক ছাড়া আর সবই আছে। রাজনীতিক, অর্থনীতিক, স্বার্থনীতিক, ব্যবসায়ী, দালাল, সিনেমা ও থিয়েটারের নটনটী, ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার, মুর্দ্দাফরাস—সবই আছে। সাহিত্যিক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয়, আছে তবে সভার অন্ত্যজ পাড়ায় অর্থাৎ সবচেয়ে দূরে, তাহাদের জন্য কয়েকখানি কাঠের ভাঙ্গা চেয়ার নির্দ্দিষ্ট আছে। রামকান্ত ও বনমালী সেখানে গিয়া বসিল। বাঙ্গালী সাহিত্যের সম্মান করিতে জানে।

সভায় মুখ্যস্থানে প্রশস্ত ও সুসজ্জিত মঞ্চের উপরে একদল সভাসুন্দর ব্যক্তি, তাহাদের সম্মুখে সিংহাসনে সভাপতি উপবিষ্ট।

বনমালী শুধাইল—উনি বুঝি সভাপতি? তা উনি কি বই লিখেছেন?

রামকান্ত বলিল—তা কে জানে।

—তবে ওঁর পরিচয় কি?

—পরিচয় কে জানে! উনি সহরের দপ্তরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বই ওরকম সুন্দর করে আর কেউ বাঁধাতে পারে না।

—আর ওঁরা সব?

—ওঁরা কেউ কালির কারখানার মালিক, কারো আছে কাগজের কল, কারো আছে ব্লক তৈরীর ব্যবসা, উনি হচ্ছেন গিয়ে কাগজের দালাল, উনি মস্ত ছাপাখানার মালিক—

এই বলিয়া রামকান্ত সকলের পরিচয় দিতে লাগিল।

বনমালী বলিল—কিন্তু দাদা, এসব কি সাহিত্য?

—নয় কেন? এই সবই তো সাহিত্যের পোনে ষোল আনা। সাহিত্য মানে লেখা তো এক পয়সা। তাও আবার ঘষা পয়সা! থাকলে ভালো, না না থাকলে ত আরও ভালো!

বনমালী শুধাইল—আর ঐ মঞ্চের সামনে যারা বসেছেন তাঁরা—

—তাঁরা কেউ উকিল, কেউ ব্যারিষ্টার, কেউ ডাক্তার, রাজনীতিক, দালাল, ওঁরা সব সিনেমার ও থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রী!

—ওঁরা কি সাহিত্যিক?

—এদেশে সাহিত্যিক নয় কে? কেবল যারা লিখে থাকে তারা ছাড়া।

—ওরা বুঝি সাহিত্যরসিক?

—রসিক সন্দেহ নেই, তবে সাহিত্যরসিক নয়?

—কেন?

—কেন কি! অনেকে পড়ে না, অনেকে পড়তে জানে না!

—তবে এ কি রকম সাহিত্যসভা?

—তুমি আর কি প্রত্যাশা করেছিলে?

—সাহিত্যিক নেই কেন?

—আছে বই কি! ঐ যে দূরে ভাঙা চেয়ারে, ছেঁড়া ধুতি চাদরে উপবিষ্ট

ওরাই সাহিত্যিক—অর্থাৎ লেখক—আর কিছু করিবার ক্ষমতা নেই তাই লেখে —আর ভাবে ওটা মস্ত ক্ষমতা।

তারপরে বলিল, তোমার স্বাভাবিক স্থানও ঐখানে কিন্তু নেহাৎ আমার সঙ্গে এসেছো বলে এতদূরে এগোতে পেরেছ।

বনমালী শুধাইল—দাদা, কিছ মনে কর্‌্যো না—তুমিও কি সাহিত্যিক ?

—নই কেন ? সবচেয়ে বড় পত্রিকার মালিকের আমি খাস খানসামা, তাঁর তামাক সেজে দিই, গায়ে তেল মাখিয়ে দিই, সাহিত্যিককের লেখা নিয়ে বাক্সবন্দী করে রাখি—এর পরেও সাহিত্যিক আর কিসে হয়।

উভয়ের যখন ঐরূপ আলোচনা চলিতেছে—তখন ওদিকে সভার কাজ চলিতেছিল।

দেশের যে যেখানে গত দশ বছরের মধ্যে মরিয়াছিল তাহাদের জন্য শোক প্রকাশ করা হইল। তার পরেই কমিক গান ও গজল গীত হইল, তাসের ম্যাজিক দেখানো হইল, একজন মাংসপেশীর ক্রীড়াচাতুর্য্য দেখাইল—আর একজন চুলে বাঁধিয়া আড়াই-মণি প্রস্তরখণ্ড তুলিল, তারপরে একজন পা উপরে তুলিয়া হাত দিয়া হাঁটিয়া গেল, আর সকলে ঘন ঘন করতালি দিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল।

তারপর কয়েকটি মেয়ে ভুল সুরে "মোদের গরব, মোদের আশা" বাংলা ভাষার মহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল, এমন সময় এক অঘটন ঘটিল। সভার দ্বারপ্রান্তে এক ভীষণদর্শন ষাঁড় দেখা দিল, তাহার নয়ন ঘূর্ণিত, নাসারন্ধ্র স্ফীত, সে স্থিরভাবে একবার সভাস্থল দেখিয়া লইল, তারপর শিং নীচু করিয়া সকলকে ছাড়িয়া বনমালীর দিকে ধাবিত হইল। বাংলাদেশের ষাঁড়ও জানে বাঙালী লেখকের মতো এমন সহজবেধ্য লক্ষ্য আর নাই। বনমালী সভাস্থল ছাড়িয়া প্রাণভয়ে ছুটিল, ষাঁড়টাও পিছু পিছু ছুটিতেছে। বনমালী আর ছুটিতে পারে না, এমন সময়ে হুচোট খাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মূর্চ্ছা ভাঙিলে দেখিল যে সে ব্রহ্মার পায়ের কাছে পড়িয়া আছে।

ব্রহ্মা শুধাইলেন—কি, পুনর্জ্জন্মের সাধ মিটিল?

বাল্মীকি বলিল—আপনি অন্তর্য্যামী, সকলই জানেন।

ব্রহ্মা বলিলেন—আমি সবই জানি এবং আগেই জানিতাম। এখন কি করিবে?

বাল্মীকি বলিলেন—আর পৃথিবীতে নয়। এখানেই থাকিব।

এই বলিয়া ব্রহ্মাকে একটা প্রণাম করিয়া পুরাতন বীণা বাজাইতে বাজাইতে ভূতপূর্ব্ব বনমালী অর্থাৎ বাল্মীকি স্বর্গীয় অরণ্যের দিকে প্রস্থান করিল।

# পুতুল

অবশেষে ক্লাবের সকল মেম্বারই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল—তপন দীর্ঘকাল অনুপস্থিত। এমন কখনো ঘটে না। কাহারো পক্ষে ঘটে না—তপনের পক্ষে তো নয়ই। এক দিন অনুপস্থিত হইলে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তিন দিন অনুপস্থিত হইলে জরিমানা অনিবার্য্য - সাত দিনের অনুপস্থিতিতে নাম কাটিয়া দিবার নিয়ম, এমন অনেকের নাম কাটা গিয়াছে। তপনের নামটাও কাটা যাইত, কিন্তু তবে সে কিনা ফাউণ্ডার মেম্বারদের একজন তাই নামটা এখনো খাতা হইতে অপসারিত হয় নাই। আরও একটা কারণে ক্লাব হইতে নাম কাটা যায়, বিবাহ করিলে। ক্লাবের নাম Bachelors' Club,—অবিবাহিত পুরুষ ইহার মেম্বার, বিবাহ করিবামাত্র নাম কাটা যায়, তা সে যতদিনের মেম্বারই হোক্ না কেন।

ক্লাবে উপস্থিতি-অনুপস্থিতির হিসাব খুব কড়া, কলেজের পারসেণ্টেজের ব্যাপারে ইহার সিকিভাগ কড়াকড়ি হইলেই কলেজ ভাঙিয়া যাইত। তারপরে আরও একটা অসুবিধা এই যে এখানে Proxy দিবার উপায় নাই—সভ্য সংখ্যা সকলভাবে সুনির্দিষ্ট, মাত্র তেরোজন।

জাজিম বিছানো, তাকিয়া বিকীর্ণ প্রশস্ত ফরাসের উপরে চায়ের বাটি সম্মুখে রাখিয়া মেম্বারগণ সেদিন যে-আলোচনায় নিযুক্ত ছিল, তাহা ঐ

তপনের অপ্রত্যাশিত অনুপস্থিতির সম্বন্ধেই। মাঝখানে দুই সেট তাস অনাদরে পড়িয়া আছে ; আজ তাহারা মেম্বারদের করপল্লব বিচ্যুত।

মেম্বারদেব মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইতেছে—

রণেন ॥ অসুখ করলো নাকি ?

শ্রীশ ॥ আফিসে নিয়মিত আসছে, কাজেই অসুখ নয়।

গোপেন ॥ তার মানে কল্‌কাতাতেই আছে।

রণেন ॥ বাড়িতে একবার খোঁজ করলে হয়।

শ্রীশ ॥ বাড়ীতে গিয়েছিলাম, দেখলাম বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র উঠে গেছে ।

রণেন ॥ ঠিকানা ?

শ্রীশ ॥ জানিয়ে যায়নি।

রণেন ॥ তাব মানে ?

শ্রীশ ॥ সেটাই তো গবেষণাব বিষয়।

রণেন ॥ আশ্চর্য্য !

এইবারে বারোজন মেম্বাব বারোটি সিগারেট ধরাইল, বোঝা গেল যে এবারে গবেষণা সুরু হইবে। ধূমায়মান সিগারেট গবেষণার অপরিহার্য্যতম উপাদান।

পাঁচ মিনিটকাল সকলের নীরবে ধূমপান। বায়ুমণ্ডল ধূমসিক্ত হইয়া উঠিলে গোপেন বলিল—শেষে প্রেমে পড়লো নাকি !

রমেশ ॥ ইম্‌পসিব্‌ল ।

রণেন ॥ কেন শুনি ?

রমেশ ॥ তপন পড়বে প্রেমে ? তাহলে কোনদিন তুমিও বিয়ে করবে।

রণেন ॥ তোমরা নাম কেটে দেওয়ার নিয়ম উঠিয়ে দাও, দেখো বিয়ে করি কিনা !

রমেশ ॥ শ্রীশ, তুমিও তো একবার কিছুদিন অনুপস্থিত হ'য়েছিলে।

শ্রীশ ॥ সেকথা তুলে আর লজ্জা দাও কেন।

রমেশ ॥ লজ্জা কি? মাধব, নৃপেন, হরিশ অনেকেই তো কিছুদিন ক'রে অনুপস্থিত হ'য়েছে।

শ্রীশ ॥ অনেকে বটে—কিন্তু কারণটা অনেক নয়—এক।

রমেশ ॥ সেই কারণ কি তপনের ক্ষেত্রে ঘট্‌তে পাবে না?

শ্রীশ ॥ ঘট্‌লে মন্দ হয় না, আমাদের বড়ই ঠাট্টা করেছিল।

রমেশ ॥ ঠাট্টা করবারই বিষয়। একটা পুতুল নিয়ে তোমরা যে কাণ্ড করেছিলে।

শ্রীশ ॥ হিন্দুমাত্রেই পৌত্তলিক।

রমেশ ॥ অনেক ব্রাহ্ম সন্তানও পৌত্তলিক হ'য়ে উঠেছে শুনতে পাই।

গোপেন ॥ অসম্ভব নয়, হিন্দু প্রতিবেশীব প্রভাব।

শ্রীশ ॥ তোমার ঐ প্রতিবেশী শব্দটায় আমাব ঘোবতর আপত্তি।

গোপেন ॥ হবারই কথা, কেননা প্রতিবেশী পুতুল থেকেই যে বিপদ্‌।

নৃপেন ॥ একটা প্রস্তাব ক'রে পুতুল, প্রতিবেশী আব ৬৬নং—এই তিনটা শব্দের উচ্চারণ ক্লাবে বন্ধ করতে হবে।

গোপাল ক্লাবের নূতন সদস্য। সব ইতিহাস তাহাব সুপরিজ্ঞাত নয়। সে শুধাইল—

পুতুল আর প্রতিবেশী শব্দ দুটোর অর্থ অনুমান করতে পারছি, কিন্তু ৬৬নং-এর অর্থ কি?

রমেশ ॥ আগে ও দুটোর কি অর্থ অনুমান করেছো বলো—

গোপাল ॥ প্রতিবেশীর মেয়ে বা বোন যাব নাম পুতুল, তারই প্রেমে তোমরা পড়েছিলে।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—প্রেমে পড়েছিলাম সত্য, কিন্তু মেয়েও নয়, বোনও নয়।

গোপাল ॥ তবে কি—'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী'!

—প্রায় তাই।

গোপাল ॥ আর ৬৬নং বুঝি প্রতিবেশীর বাড়ির নম্বর।

রমেশ ॥ না তার পাশের বাড়ির নম্বর।

গোপাল ॥ তার মানে?

শ্রীশ ॥ ঐ বাড়িটায় কিছুকাল বাস ক'রে ওঁরা সব ঘা খেয়েছেন।

গোপাল ॥ কি রকম?

শ্রীশ ॥ জানতে চাও তো কিছুদিন ৬৬নং বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকোগে।

গোপাল ॥ খালি আছে?

শ্রীশ ॥ ও রকম বাড়ি কখনো খালি থাকে? খুব সম্ভব তপন এখন ওখানে গিয়ে পৌত্তলিক হ'য়ে উঠেছে।

গোপাল ॥ সে কি তোমাদের অভিজ্ঞতা জানে না?

শ্রীশ ॥ জানে কিন্তু বিশ্বাস করে না।

রমেশ ॥ কিম্বা হয়তো বিশ্বাস করে বলেই গিয়েছে।

গোপাল ॥ নাঃ সব ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌ছে।

এমন সময়ে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল এবং পর মুহূর্ত্তেই ঝড়ের গতিতে তপন ঘরে ঢুকিয়া ফরাসে শুইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—হোপলেস্।

সকলে সমস্বরে বলিল—কি হ'ল? এতদিন কোথা ছিলে? ইত্যাদি।

রমেন ॥ তুমি নাকি বাড়ি বদ্‌লেছ?

তপন ॥ হাঁ।

রমেশ ॥ ঠিকানা কি?

তপন যে ঠিকানা বলিল সেটা তাহার পূর্ব্বতম বাড়ির।

শ্রীশ ॥ ওতো পুরানো ঠিকানা।

তপন ॥ আবার সেখানেই ফিরে এসেছি।

শ্রীশ ॥ মাঝখানে কোথায় উঠে গিয়েছিলে?

তপন ॥ ৬৬নং—ষ্ট্রীটে।

সকলে ॥ হুর্‌রে !

তপন ॥ চীৎকার করছো কেন ?

শ্রীশ ॥ এবারে সব বুঝেছি।

তপন ॥ কি বুঝ্‌লে ?

শ্রীশ ॥ পাশের বাড়ির দোতালার ঈষন্মুক্ত জানলা পথে।

রমেশ ॥ অস্পষ্টদর্শন তন্বী কুমারী নারী।

নৃপেন ॥ তারপরে পত্র লিখন।

রণেন ॥ পরে নারী হস্তাক্ষরে পত্রোত্তর প্রাপ্তি।

রমেশ ॥ তারপরে উক্ত কুমারীর দাদার সঙ্গে পরিচয়।

শ্রীশ ॥ তার মুখে সংবাদ প্রাপ্তি যে ভগ্নীর চিত্ত বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

তপন ॥ সব মিলছে, বলে যাও।

শ্রীশ ॥ দাদাকে **Patronise** করবার উদ্দেশ্যে তার কাছ থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জামা কাপড় খরিদ।

রমেশ ॥ লোকটার কাপড়ের ব্যবসা আছে।

তপন ॥ আমি এই কয়দিনে প্রায় হাজার টাকার কাপড় কিনেছি। কিন্তু লোকটা দোকানের ঠিকানা দিত না, বল্‌তো দোকানে গেলে বেশি দাম চার্জ্জ করবে, আপনার সঙ্গে তো ব্যবসার সম্পর্ক নয়! কেনা-মূল্যে এনে দিচ্ছি !

রমেশ ॥ তন্বী বড়ই লাজুক, বরাবর চিঠি লিখেছে কিন্তু পাশের বাড়ির জানালায় থেকেও কখনো একটি কথাও বলেনি।

তপন ॥ তোমাদের অনুমান ঠিক, কিন্তু এত কথা জান্‌লে কি ক'রে ?

শ্রীশ ॥ তারপরে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি সুরু করলে তখন—

তপন ॥ হঁা, তাই. হঠাৎ হাসপাতালে গেল—আর ফিরলো না। আজ সকালে তার দাদা এসে সংবাদ দিলে, যে মৃন্ময়ীর মৃত্যু হয়েছে।

শ্রীশ ॥ .তাই বুঝি ও বাসা ছেড়ে উঠে এলে ?

তপন ॥ হঁা ভাই, আর ওখানে মন টিক্‌লো না।

শ্রীশ ॥ তা বেশ করেছ, কিন্তু তোমার মানসী হাসপাতালে যায়নি, গিয়েছে ছুতোরের দোকানে।

তপন ॥ তার মানে ?

রমেশ ॥ এতদিনেও বুঝ্‌তে পারনি ? কবি হ'লে এমনই হয় বটে !

তপন ॥ কেন, কেন, কি অনুমান করছো বলো। ·

শ্রীশ ॥ যাকে দেখে তুমি ভুলেছ সে মানুষ নয়, কাঠের পুতুল।

তপন ॥ দেখো শ্রীশ, মানুষের হৃদয় নিয়ে ঠাট্টা করা অকর্ত্তব্য।

শ্রীশ ॥ বন্ধু, হৃদয় হ'লে নীরব হ'য়েই থাক্‌তাম। বড় বড় কাপড়ের দোকানে সাজ পোযাক পরা পুতুলগুলো দেখেছ তো ? তারই একটিকে পাশের জানলায় দেখেছিলে।

তপন ॥ অসম্ভব ! তোমার কথার প্রমাণ ?

শ্রীশ ॥ স্ত্রীলোক কখনো কথা না বলে থাক্‌তে পারে ? তার কথা কখনো শুনেছ ?

তপন এবারে শুইয়া পড়িল—বলিল—এসব তোমরা জান্‌লে কি ক'রে ?

—আমরা অনেকেই ঐ ৬৬নং-এর আসামী কিনা ?

তপন ॥ তার মানে ?

শ্রীশ ॥ ঘটনাচক্রে ঐ বাসা ভাড়া নিয়েছিলাম, তারপরে দেখেছিলাম তন্বীকে !

রমেশ ॥ ৬৬নং-এর বাড়িটার মালিক তন্বীর দাদা।

নৃপেন ॥ সে দেখে দেখে অবিবাহিত যুবককে ভাড়া দেয়।

মাধব ॥ তারপরে বোনের প্রেমের সুযোগে কাপড় বেছে নেয়—আমি সাত দিনে কিনেছিলাম দেড় হাজার টাকার কাপড়।

নৃপতি ॥ আমি প্রায় হাজার টাকার।

মাধব ॥ আমি সাড়ে বারোশ।

হরিশ ॥ আমার অল্পের উপর দিয়েই গিয়েছে—পাঁচশ!

তপন ॥ তবে তোমরা সবাই ঠকেছ?

রমেশ ॥ হাঁ ভাই, তোমার দুঃখ নাই - জগৎশুদ্ধ ঠকেছে!

তপন ॥ তবে সে মানুষ নয়?

শ্রীশ ॥ নিশ্চয়ই নয়।

তপন ॥ কাজেই সে মরেনি।

শ্রীশ ॥ কাজেই তাকে ভালোও বাসনি।

তপন ॥ না ভাই, তা বেসেছিলাম।

রমেশ ॥ সে কথা মিথ্যা নয়। রজ্জু যতক্ষণ সর্প ততক্ষণ ভয় অবশ্যই হয়!

তপন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, পুতুলকে যতক্ষণ মানুষ ব'লে মনে করেছিলাম সত্যিই ভালোবেসেছিলাম।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় বলিয়া উঠিল—"পুতুলের রূপে যার ঐছন করিল গো, রমণী হইলে কিবা ভয়"!

ক্লাবের সেক্রেটারি রমেশ বলিল—তপন, ঘটনার গুরুত্ব বিচার ক'রে তোমার অনুপস্থিতি মার্জ্জনা করা হ'ল।

তপন ॥ ধন্যবাদ ভাই সব। ওদিকে পুতুল গেল - আবার এদিকে মানুষ গেলে আমার যে দুই কূল যেতো!

এই বলিয়া সে এক সেট তাস তুলিয়া লইল—এবং তাহার সদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্য সকলেও তাসের বিবিগুলির প্রতি আত্মনিবেশ করিল। তাসের বিবি অন্ততঃ পাশের বাড়ীর তন্বীর চেয়ে অধিকতর সত্য।

গভীর রাত্রে শয্যায় জাগিয়া উঠিয়া তপন এক প্রকার স্বস্তিমিশ্রিত আনন্দ অনুভব করিল—অনেক দিনের ভাঙা ঠ্যাং জোড়া লাগিয়া গেলে নাড়িতে গিয়া যেমন স্বস্তি পাওয়া যায়, অনেকটা সেই রকম। এ দুঃখ কেবল তাহার একার নয়, অনেকেরই। যে দুঃখ সার্ব্বজনীন তাহা কি আর তেমন পীড়িত করে? ব্যক্তিগত দুঃখই তো দুঃখ! যে জল কূপের মধ্যে সঞ্চিত হইলে ডুবাইয়া মারে, তাহাই সারা মাঠে ছড়াইয়া পড়িলে পায়ের পাতাও ভেজে না!

# যমরাজের ছুটি

ব্রহ্মা বলিলেন—যমরাজ!

যমরাজ বলিলেন—কি প্রভু?

—তোমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ।

—কি রকম?

—তুমি মর্ত্ত্যের মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেছ।

—আর একটু খুলিয়া বলুন।

—তাহাদের বাঁচিবার ব্যক্তিস্বাধীনতায়—

—বুঝিলাম না।

তবে শোনো। তোমার উপদ্রবে তাহারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। বন্যা, ভূমিকম্প, যুদ্ধ, বিগ্রহ, রোগ, মহামারী, গাড়ীচাপা প্রভৃতি বিচিত্র উপায়ে তাহাদের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিতেছ বলিয়া তাহারা অভিযোগ করিয়াছে।

যমরাজ বলিলেন—মৃত্যুই যে মানুষের ধর্ম্ম।

ব্রহ্মা বলিলেন—তাহারা কোন ধর্ম্মই এখন মানে না, মৃত্যুর ধর্ম্মই বা মানিবে কেন?

—তবে কি আমি রিজাইন দিব?

—না, ততদূর করিতে বলি না,—তবে তুমি কিছুদিন ছুটি লও না কেন!

—বেশ তাই হইবে—পৃথিবীতে জানাইয়া দিন।

ব্রহ্মা বলিলেন—সাধু! সে ব্যবস্থা আমি করিতেছি।

মানুষ জানিল যে তাহাকে আর মরিতে হইবে না।

অমনি পৃথিবীর যেখানে যত মন্দির, ধর্ম্মস্থান, তীর্থ আছে—সব জায়গায় তালাচাবি পড়িল। মরিতেই যখন হইবে না, তখন আবার ধর্ম্মে কাজ কি? দেবতার আরাধনাই বা কেন?

অনেকগুলি মন্দিব সিনেমা গৃহে পরিণত হইল, অনেক দেবালয় পাঠশালায় পরিবর্ত্তিত হইল—ওগুলো খামকা পড়িয়া থাকে কেন?

মৃত্যু যখন নাই, প্রাণ যখন কিছুতেই বাহিব হইবাব নয়, তখন আবার উপার্জ্জনের প্রয়োজন কি? প্রাণধারণের উদ্দেশ্যেই উপার্জ্জন, প্রাণ তো কিছুতেই যাইবে না—তখন আবাব অত হাঙ্গামা কেন? কাজেই নিম্নতম হইতে উচ্চতম অবধি সমস্ত বিদ্যায়তনে তালা বন্ধ হইল, বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঘাস গজাইয়া গেল। ছাত্ররা হাওয়া এবং শিক্ষকেরা সেই ঘাস খাইতে সুরু করিল। প্রাণ যখন যাইবাব নয়, তখন যাহা খুশি খাওয়া যাইতে পারে, একেবারে না খাইলেও চলে, তবে পুরাতন সংস্কারের খাতিরে কিছু খাওযা দরকার। সে উদ্দেশ্যে ঘাসই বা মন্দ কি!

ঘাস গোরুর খাদ্য, সেই ঘাস মানুষে খাইযা ফুবাইল, কাজেই খাদ্যাভাবে গোরু ও অন্যান্য তৃণভোজী পশু মরিতে সুরু করিল—তাহারা তো যমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নাই।

যুদ্ধে প্রাণ যায় বলিয়া এ পর্য্যন্ত যুদ্ধ সম্বন্ধে মানুষের কিছু সঙ্কোচ ছিল, কিন্তু এখন সে ভয় না থাকায় এবং উপার্জ্জনের চেষ্টা দূরীভূত হওয়ায় মানুষের হাতে যে অপর্য্যাপ্ত সময় আসিল তাহার ফলে মানুষ বিবামহীন যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ করিয়া দিল! যুদ্ধে এক পক্ষ মরিয়া সাবাড হয বলিয়াই সাধারণতঃ যুদ্ধ থামে —কিন্তু এখন তো কেহ মরে না বড় জোর চিৎ হইয়া যায় কাজেই এখন

যুদ্ধ থামিবার আর কোন কারণ রহিল না। যুদ্ধ চিরকালই অকারণে হয়—এখনও অকারণে হইতে লাগিল। কিন্তু এখন আর কেহ প্রাণ হারায় না বলিয়া যুদ্ধ থামিবার কোন সঙ্গত কারণ রহিল না। এমন কি আণবিক বোমা মারিলেও আর কেহ মরে না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া আবার রণং দেহি বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে।

যমরাজের ছুটি বলিয়া মানুষ মরে না বটে—কিন্তু বয়স বাড়িতে বাধা নাই। বৃদ্ধ লোকে, জীর্ণদেহে, রুগ্ন ও মুমূর্ষু ব্যক্তিতে পৃথিবী ভরিয়া গেল। যেখানেই যাও কেবল কাশির খক্‌খক্‌, লাঠির ঠক্‌ঠক্‌, রোগের কাৎরানি মুমূর্ষুর নাভিশ্বাস! কোথাও হাসি নাই, গান নাই, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, আনন্দ কিছুই নাই। এখন নাতিও যেমন বৃদ্ধ, পিতাও তেমনি বৃদ্ধ, পিতামহও তেমনি বৃদ্ধ। জীবনধারণের জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা না থাকায় শীতের সন্ধ্যার মতো বার্দ্ধক্য এখন আগেই আসিয়া পড়ে, কাজেই তরুণী দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ হয়, বালিকা দেখিতে দেখিতে তরুণী হয়, মানুষ এখন বার্দ্ধক্যে দ্রুত ডবল প্রোমোশন পাইয়া থাকে।

গাছের ডালে বসিয়া ক্রৌঞ্চমিথুন আনন্দ করিতেছিল। অকাল বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র সেই দৃশ্য দেখিয়া বলিল—আহা, আমি যদি অমনি আনন্দ করিতে পারিতাম!

পাখী দুটি বলিল—করো না কেন?

অবশ্য পাখীতে এমন করিয়া কথা বলিতে পারে না, কিন্তু পাখী দুটি বিধাতা প্রেরিত, কাজেই এক্ষেত্রে পারিল।

নবীনচন্দ্র বলিল—উপায় কি?

—মরিয়া নূতন জন্মগ্রহণ করো।

—মরিবার উপায় কি?

—বিধাতার কাছে প্রার্থনা করো।

তখন নবীনচন্দ্র নতজানু হইয়া বসিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল- হে বিধাতঃ,

আমাকে মারিয়া ফেলো। এই চিরন্তন জরার কারাগার হইতে, এই নিরানন্দের মরুভূমি হইতে, এই বার্দ্ধক্যের মেরুপ্রদেশ হইতে রক্ষা করো।

সে বলিতে লাগিল, আমাকে মৃত্যু দাও সেই সঙ্গে নবীন জীবন দাও, যাহাতে আনন্দ ও সৌন্দর্য্য আছে, যৌবনের তরঙ্গ আছে! আমি আর জীবন্মৃত হইয়া টিকিয়া থাকিতে চাই না।

নবীনচন্দ্রের প্রার্থনা শুনিয়া কাতারে কাতারে বৃদ্ধ বৃদ্ধা নতজানু হইয়া ঐ একই প্রার্থনা জানাইতে লাগিল—প্রভু, আমাদের মৃত্যু দাও, আর আমরা এমন স্থবির হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারি না! জীবনের জগদ্দল ভারের চেয়ে ভয়াবহ মৃত্যুও অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়।

বিধাতার কানে সাধারণতঃ মানুষের প্রার্থনা পৌছায় না, কিন্তু এ প্রার্থনাটি পৌছিল।

তিনি হুকুম দিলেন—একবার যমরাজকে খবর দাও।

যমরাজ খবর পাইয়া আসিয়া হাজির হইলেন এবং বলিলেন—প্রভু, কি খবর?

—শুনিতে পাইতেছ না?

—পাইতেছি বই কি!

—তবে যাহোক একটা উপায় করো।

—তাহা হইলে আমার ছুটি ফুরাইল, প্রভু?

ব্রহ্মা বলিলেন—তাহা ছাড়া আর উপায় কি?

যমরাজ বলিলেন—আমি তবে ব্যবস্থায় লাগিয়া যাই।

পৃথিবীতে ভয়াবহ মহামারী, মন্বন্তর, ভূকম্পন, বন্যা প্রভৃতি সুরু হইয়াছে। দলে দলে লোক মরিতেছে—কিন্তু কাহারো দুঃখ নাই, সবাই বলিতেছে—আঃ বাঁচিয়া গেলাম। পৃথিবী মানবহীন হইতে চলিল। মানুষ মরিয়া বাঁচিল!

# ছেঁড়া কাঁথা ও লাখ টাকা

ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া লক্ষ টাকার স্বপ্নদর্শন সংসারে উপহসিত হইয়া থাকে। কেন যে লোকে উপহাস করে আমি তো বুঝিতে পারি না। একটু তলাইয়া দেখিলেই বেশ স্পষ্ট হইবে যে ইহাই সংসারের বহুল প্রচলিত রীতি। মানুষ মাত্রেই কোন না কোন রূপে ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছে। আর যদি লাখ টাকা সত্যিই কাম্য হয়, তবে তাহার চিন্তার উপযুক্ত আসন যে ছেঁড়া কাঁথা তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ। বিপরীতের সমন্বয় সাধনই মনুষ্যত্ব লাভের অঙ্গ! ছেঁড়া কাঁথা ও লাখ টাকার বিপরীত সত্যটা কি? দামী মছলন্দে বসিয়া কোন ধনীকে মুড়ি খাইতে দেখিলে—কই আমরা তো তাহাকে উপহাস করি না—বরঞ্চ বলি, আহা লোকটার জীবনযাত্রা কি সরল! বলি, লোকটা ইচ্ছা করিলে দিনরাত্রি সন্দেশ খাইতে পারে, তবু কি সাদাসিধাভাবে জীবন যাপন করিতেছে। তবে যে ব্যক্তি লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিবার ইচ্ছায় কাঁথায় উপবেশন করিয়াছে—তাহাতে বিদ্রূপ কেন?

ইতিহাসে পাওয়া যায় যে হারুন-অল-রসিদ ও আকবর বাদশা দরিদ্রের ছদ্মবেশে নগর [ভ্রমণ করিয়া প্রজাদের] সুখ দুঃখের সন্ধান লইতেন। ইঁহারা দুজনেই অবশ্য আদর্শ নরপতি। কিন্তু তাঁহাদের এই দীনতার ছদ্মবেশ কি শুধুই রাজনৈতিক কারণ সঞ্জাত? তাহার অধিক কি কিছুই নয়? ধর্ম্মবীর

অশোক ও গান্ধী ছিন্ন চীর পরিধান করিয়া দীনতম ব্যক্তির সমগোত্রত্ব অবলম্বন করেন। তাঁহাদের এই ছিন্ন চীর পরিধান শুধুই কি ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত? তাহার অধিক কি কিছুই নয়? ইহারা সকলেই বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া অহোরাত্র বসিয়া থাকিতে পারিতেন। তবে এমন করিলেন কেন? আমার তো মনে হয় এই সব দৃষ্টান্ত ওই ছিন্ন কন্থা ও লক্ষ টাকার স্বপ্নেরই রূপান্তর মাত্র। হারুণ অল রসিদ ও আকবর, অশোক ও গান্ধী ছিন্ন কন্থার অন্তরাল হইতে একটি মহৎ আদর্শকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষ যেমন শাদা কাঁচখণ্ডের উপরে কালো ভুষি মাখাইয়া সর্বজ্যোতিকৃৎস সূর্য্যকে দর্শন করে—অনেকটা তেমনি আর কি। কালোর সাহায্য ছাড়া আলোকে প্রণিধান করা যায় না। তান্ত্রিক সাধকগণ যেমন শবাসনে উপবিষ্ট হইয়া জীবনের সাধনা করেন—অনেকটা তেমনি। মৃত্যুর সাহায্য ব্যতীত জীবনের রহস্য বুঝিতে পারা যায় না। কাজেই লক্ষ টাকার স্বপ্নই যদি দেখিতে হয় ছিন্ন কন্থাই তাহার প্রকৃষ্ট আসন। বিপরীতের আশ্রয় নহিলে সত্য দর্শন অসম্ভব। সেকালের শ্রেষ্ঠ বীর অর্জ্জুন বৃহন্নলার ছদ্মবেশে লুক্কায়িত থাকিয়া কুরুক্ষেত্রের বীর্য্যময় প্রভাতের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। আর সময় আসিলে দেখা গেল বংশী বিলাসী কৃষ্ণের বাঁশরী খসিয়া পড়িয়া তাঁহার হস্তে সুদর্শন চক্র আবিষ্কৃত হইল। রামচন্দ্রের জীবনের বারো আনাই তো বল্কল পরিহিত অবস্থার কাহিনী। এ সমস্তই কি ছিন্ন কন্থার রূপান্তর নয়? আর লক্ষ টাকা বলিতে যে শত-সহস্র মুদ্রা বিশেষকে বুঝাইতেছে না—তাহা আশা করি বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। লক্ষ টাকার অর্থ একটা দুর্লভ আদর্শ। আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই টাকা সবচেয়ে কাম্য অথচ সবচেয়ে দুর্লভ—তাই লক্ষ টাকা রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ওই রূপা রূপক ছাড়া আর কি? তাহ হইলে রূপক ভাঙিলে দাঁড়ায় এই যে মহৎ আদর্শের সাধনের জন্য তাহার বিপরীতের আশ্রয় গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এইবারে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলির মর্ম সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

বস্তুতঃ ছিন্ন কন্থা অবলম্বন করিয়া লক্ষ মুদ্রার ধ্যানের রূপকেই আমাদের পুরাণ ও সাহিত্য পরিপূর্ণ। অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছি। আরও দেওয়া যাইতে পারে। এই সাধন মার্গের শ্রেষ্ঠ পথিক মহাদেব। তিনি ছিন্নবাস পরিধান করিয়া অন্নপূর্ণার নিকট হাত পাতেন। যে বার্দ্ধক্যের ছদ্মবেশে তিনি উমার প্রেমের পরীক্ষা করিয়াছিলেন—তাহাও যে এক প্রকার ছিন্ন কন্থা। আবার অন্য দেবতাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত যে হলাহল তিনি পান করিয়াছিলেন সেই হলাহলও কি তবল ছিন্ন কন্থা নয়? মহাদেব তো ইচ্ছা করিলেই দিব্য বরসজ্জায় বিভূষিত হইয়া তপস্বিনী উমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিতেন। মহাদেব তো অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেই অমৃতের অংশ পাইতেন—আর ঐহিক ঐশ্বর্য্যে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দেওয়া তো তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। তবে কেন? আর কিছুই নয়—মহাদেব আদর্শবাদী। আদর্শকে লাভ করিতে সাধনার প্রয়োজন— অন্তর্যামী তাহা না জানিবেন কেন?

কেবল পুরাণ ও সাহিত্য যে এই আদর্শে পূর্ণ মাত্র তাহাই নয়—সমস্ত শিল্পেরই ইহাই লক্ষ্য। মূর্ত্তিকার মাটী লইয়া পুতুল গড়িতে বসে—মূর্ত্তি গড়া শেষ হইলে দেখা যায় কালো মাটী একটি অপূর্ব্ব পুতুলে পরিণত হইয়াছে। মূর্ত্তিকার ছিন্ন কন্থায় বসিয়া সাধনা আরম্ভ করিয়াছিল—পুতুলটি তাহার করায়ত্ত লক্ষ মুদ্রা। সেক্সপীয়রের নাটক রচনার মৌলিক উপাদান কতকগুলি জীর্ণ কন্থা—তাঁহার নাটক সমূহ, নাটকের চরিত্র সমূহ, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, লীয়ার, ক্লিওপেট্রা উজ্জ্বল স্বর্ণ মুদ্রা। মূল্যবান আসনে বসিলে আসনটাই মনোহরণ করিয়া নেয়—তখন আর মনের ঊর্দ্ধগামিতা থাকে না সেই জন্যই পৃথিবীর স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া রাজা-মহারাজার দল গরীবের ভিটামাটি ও অন্নমুষ্টি কাড়িয়া লইবার ফন্দি আঁটিতে থাকেন। সেই সিংহাসন-দ্বীপান্তরিতের দল সিংহাসনটার চেয়ে উচ্চতর আর কিছু কল্পনা করিতে একেবারেই অক্ষম। এ সত্য যুবরাজ অশোক ভালো করিয়াই জানিতেন—তাই তিনি মাটীর উপরে

জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি যদি সরাসরি আসিয়া সিংহাসনে বসিয়া পড়িতেন তবে পৃথিবীর ইতিহাসে কি শোচনীয় পরিণামই না ঘটিত!

তাই বলি পাঠক, তোমার ও আমার কি সৌভাগ্য যে অদৃষ্ট কর্তৃক আমরা ছিন্ন কন্থার উপরেই স্থাপিত হইয়াছি। আবার তাও বলি পাঠক, এই মূল সৌভাগ্যের বাঞ্ছনীয় পরিণাম লাভ করিতে আমরা সক্ষম হইতেছি না। ছিন্ন কন্থা আমাদের এতই বিরক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে লাখ টাকার চিন্তা করিতেও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি ছেঁড়া কাঁথায় বসিয়া লাখ টাকার কথা চিন্তা না করাই অপরাধের। তবে কি ছেঁড়া কাঁথায় বসিয়া ভাঙা ঘরের কথা চিন্তা কবিব? তাহাতে লাভ কি? তাহাতে কোন্ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়?

পাঠক, তোমার কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, আমি নিজে একজন ছিন্ন কন্থার নিষ্ফল সাধক। আমি টাইম টেব্‌লরূপ ছিন্নকন্থা সম্মুখে রাখিয়া বিনা পাথেয়ে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াই, মাঝে মাঝে বড় বড় রেল ষ্টেশনে নামিয়া কেলনারের হোটেলে ঢুকিয়া পডিয়া বিনা পয়সায় ভোজ সারিয়া লই এবং রাত্রি গভীর হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর আলোর উপরে নীল পর্দা টানিয়া দিয়া শুইয়া পড়িয়া গাড়ীর তালে তালে আন্দোলিত হইতে থাকি। পাঠক, আমি সম্মুখে বাড়ীর প্লান খুলিয়া ধরিয়া অগঠিত বাড়ীর কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াই। দক্ষিণ-খোলা দোতালার ছোট ঘরটিতে বসিয়া অলিখিত মহাকাব্য লিখিয়া যাই। আর যাহার উপরে খুশী হই— হাওয়াই ব্যাঙ্কের চেক কাটিয়া তাহাকে পারিতোষিক বিতরণ করি। এসব করিতে আমার এক পয়সাও খরচ নাই। কিন্তু তৎপরিবর্তে যে আনন্দ লাভ করি—বাস্তব ভ্রমণ, বাস্তব বাড়ী, বাস্তব চেক হইলে সত্যই যে তাহার বেশি পাইতাম, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। লক্ষ টাকা থাকিলে একটি টাকাও দান করিতে পারিতাম কি না সংশয়। খুব সম্ভবতঃ তখন অপরের ছেঁড়া কাঁথাখানা টান দিবার চেষ্টা করিতাম।

পাঠক, তোমার ছেড়া কাঁথা আছে কিনা জানি না। যদি না থাকে—তবে আমার এই রচনাটি সে-অভাব পূরণ করিবে। ইহার উপরে সমাসীন হইয়া একবার কল্পনা করিয়া দেখিও লক্ষ টাকা পাও কি না পাও। যদি না পাও, দোষ আমার। আমার এই রচনা দামী মছলন্দ—এখনো যথেষ্ট ছিঁড়িয়া ওঠে নাই। আর যদি পাও, তবে তাহার ভাগ হইতে লেখক যেন বঞ্চিত না হয়। আর একটি রচনারূপে বর্ত্তমান লেখককে ও সাধারণ পাঠককে তাহার স্বাদ বিতরণ করিতে যেন ভুলিও না।

# দক্ষিণরায়ের দাক্ষিণ্য

রাম ও রহিমের বন্ধুত্ব গ্রামে প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। পাশাপাশি তাহাদের বাড়ী। নিতান্ত ছেলেবেলা হইতে তাহারা পরস্পরের অচ্ছেদ্য সঙ্গী। ছেলেবেলা তাহারা একসঙ্গে খেলাধুলা করিয়াছে, পাঠশালায় গিয়াছে, পাঠশালা পালাইয়াছে, তারপরে এক সঙ্গে মাইনর পরীক্ষা পাশ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া গ্রামেই রহিয়া গিয়াছে। অধিকতর বিদ্যালাভের আশায় বা চাকুরি করিবার প্রয়োজনে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া যায় নাই, যাইবার আবশ্যক ছিল না, জমিজমা তেজারতি কারবারে তাহারা সম্পন্ন গৃহস্থ। রাজনীতি ও সমাজনীতির নানা অপঘাতের আশঙ্কা সত্ত্বেও তাহাদের বন্ধুত্ব যখন ধোপে টিকিয়া গেল, তখন তাহারা আশপাশের দশটা গ্রামের হিন্দু-মুসলমান মিলনের দৃষ্টান্তস্থলরূপে দেখা দিল।

হিন্দুরা তাহাদের দেখাইয়া বলিত যে হরি সেই খোদা, মুসলমানেরা তাহাদের দেখাইয়া বলিত যে খোদা সেই হরি, আর কখনো কদাচিৎ সহরের রাজনৈতিক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাদের দেখিয়া যাইতে ভুলিত না; তাহাদের দেখিয়া বলিত, রাম রহিম না জুদা করো ভাই; তাহাদের একত্র দাঁড় করাইয়া ছবি তুলিয়া লইত, আর সহরে ফিরিয়া

সেই ছবিখানার বদলে বড় করিয়া নিজের ছবি খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিত। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের দৃষ্টান্ত আবিষ্কর্ত্তার দাবী অনেক বেশি।

২

এমন সময়ে একদিন হঠাৎ পূর্ব্ববঙ্গ 'কলমা' পড়িয়া পূর্ব্ব-পাকিস্থান নাম ধারণ করিল। গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান একবার নাড়া খাইয়া উঠিল বটে কিন্তু সে ধাক্কা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, কারণ সকলেরই মনে একসঙ্গে রাম-রহিমের বন্ধুত্বর কথা মনে পড়িল।

আর খোদ রাম ও রহিম পাকিস্থান হইয়াছে শুনিয়া একবার মুচকিয়া হাসিল মাত্র, তাহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পাবে এমন অস্ত্র মানুষের হাতে নাই।

অতঃপর যে সব কাণ্ড ঘটিতে লাগিল কাহারো অবিদিত নাই। পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দুদের অনেকে গ্রাম ত্যাগ করিতে লাগিল, খবরের কাগজের কৃপায় এবং কিম্বদন্তী যোগে অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনী ছড়াইয়া পড়িল। দুর্ঘটনার চেয়ে ভয় দুর্ভাবনার অনেক বেশি। তাই একদিন নিয়ামৎপুরের ( রাম-রহিমের গ্রামের ঐ নাম বটে ) হিন্দুরা রাম ও রহিমের বাড়িতে আসিয়া পরামর্শ চাহিল—এখন আমরা কি করি ?

রাম ও রহিম যুক্তকণ্ঠে বলিল—আমরা আছি ভয় কি ? প্রতিবেশীরা আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল।

কিন্তু আজকার দিনে আর গ্রাম লইয়া পৃথিবী নয়, পৃথিবী লইয়া গ্রাম। দেশের অভ্যুত্থানের ঢেউ মুজাহেররূপে অবশেষে এই নিয়ামৎপুরেও আসিয়া ঢুকিতে লাগিল। বিদেশী মুসলমানেরা রাম-রহিমের খবর বা খাতির রাখে না। বর্ষার প্রারম্ভে পদ্মার পাড়ি স্থানে স্থানে যেমন নিঃশব্দে ভাঙিয়া পড়ে, সন্ধ্যাবেলায় লোকে যেস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল সকালবেলায় তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না, নিয়ামৎপুরেও তেমন ভাঙন আরম্ভ হইল। হিন্দুরা একে একে সরিতে লাগিল। কেহ কলিকাতায় ছেলেকে দেখিতে গেল আর ফিরিল না, কেহ পীড়িত স্ত্রীর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গেল আর

ফিরিল না, হঠাৎ একটা গঙ্গাস্নানের যোগ পাইয়া একদল যাত্রা করিল, তাহারা ওপারে গেল কি তলাইয়া গেল—মোট কথা গ্রামে আর ফিরিল না!

সব দেখিয়া রাম বলিল—একি ব্যাপার?

রহিম বলিল- তাইতো, একি ব্যাপার? দু'জনে সমস্বরে বলিল—আমরা আছি, তবে এত ভয় কিসের?

হিন্দুরা বলিল—তাইতো ভয় কিসের? তাহারাও তলে তলে গ্রাম ত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিল। রাম-রহিমের বন্ধুত্বের প্রতি তাহাদের আর আস্থা নাই।

৩

অবশেষে গ্রামের অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে প্রায় সমস্ত হিন্দু অন্যত্র চলিয়া গেল। রাম একাকী রহিল, সে বিবাহ করে নাই, কাজেই সীতা বা লবকুশের সমস্যা তাহার ছিল না।

অবশ্য রাম ও রহিমের বন্ধুত্ব আগের মতোই অটুট আছে কিন্তু তাহার সমঝদারের অভাব ঘটিয়াছে। এক একটি হিন্দু পরিবার বাড়ি ছাড়িয়া যায়, সেখানে এক একটি মুজাহের পরিবার ভর্তি হয়, ফলে গ্রামের হিন্দু-গৃহগুলি মুসলমানে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতিতে শূন্যতা থাকিতে পায় না।

একদিন রাত্রে রাম ঘুমাইয়া আছে, এমন সময়ে রহিম আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল।

রাম শুধাইল—কি ভাই, ব্যাপার কি? রহিম বলিল—এখনি রওনা হ'তে হবে।

—কোথায়?

রহিম বলিল—যেখানেই হোক, এখানে আর থাকা চলবে না।

—কেন?

—খবর পেয়েছি, তোমার উপরে অত্যাচার করবার পরামর্শ হচ্ছে।

—তবে উপায়?

—উপায় এই, বলিয়া রহিম দু'জোড়া লুঙি ও ফেজ বাহির করিল, বলিল, একজোড়া তুমি পরো, আর এক জোড়া আমি পরি।

—তারপরে ?

—তারপরে অন্ধকার থাকতেই গ্রাম পরিত্যাগ।

তাই হইল। রাম ও রহিম লুঙি ও ফেজ পরিয়া শেষ রাত্রে গ্রাম ত্যাগ করিল।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে আসিয়া রাম ও রহিম আর একবার বেশ পরিবর্ত্তন করিল। এবারে রামের থলি হইতে একজোড়া ধুতি ও দুটি গান্ধীটুপী বাহির হইল। নূতন বেশে তাহারা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিল।

রাম ও রহিম সমস্বরে বলিল—আঃ বাঁচলাম। তাহারা পশ্চিমবঙ্গের একস্থানে একটি বাড়ি ভাড়া লইল এবং নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বিবঙ্গের ঢেউ পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছিয়া প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে।

একদিন রাত্রে নিদ্রিত রহিমকে জাগাইয়া রাম বলিল—শীগ্‌গীর ওঠো।

—কেন ?

—এখনি অন্যত্র যেতে হবে।

—কেন ?

—ওরা টের পেয়েছে যে তুমি হিন্দু নও।

—কেমন করে ?

—ওদের গণক আছে, গুণে বলে' দিয়েছে।

রহিম তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিল, শুধাইল এবার কোথায় যেতে হবে ?

সে আরও বলিল দুই-বঙ্গেরই তো পরীক্ষা হ'ল, পূর্ব্ববঙ্গে তোমার বিপদ, পশ্চিমবঙ্গে আমার বিপদ। দু'জনের স্থান একত্র হয় এমন দেশ কোথায় ?

রাম বলিল—আছে। কিন্তু তার আগে এই পোষাক পরো। এই

বলিয়া থলি হইতে সে দু'জোড়া কোট, প্যাণ্ট ও টুপি বাহির করিল, বলিল—এগুলো ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ পোষাক।

তখন দু'জনে কোট ও প্যাণ্ট পরিয়া টুপি মাথায় দিয়া শেষ রাত্রে গৃহত্যাগ করিল।

৪

রাম ও রহিম এবার সুন্দরবনে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে।

সুন্দরবন ভৌগলিকতঃ উভয়বঙ্গের অংশ হইলেও বস্তুতঃ এদেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানকার অধিপতি দক্ষিণরায়। হিন্দুর দুই পা ও মুসলমানের দুই পা মিলাইয়া তিনি চতুষ্পদ্। হিন্দু বা ইস্‌লাম কোনো ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত নাই। হিন্দু-মুসলমানের এখানে সমান অধিকার।

একদিন রাত্রে রাম ও রহিম একত্র জাগিয়া উঠিল, এবারে আর আগে পরে নয়।

কি ব্যাপার?

তাহারা দেখিল একটি বাঘ আসিয়া তাহাদের চারখানা ঠ্যাং শাকুল্যে কামড়াইয়া ধরিয়াছে।

তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—প্রাণ গেলো।

তবু তাহাদের বন্ধুত্ব গেল না, তাহারা বলিল—খোদা হরির কৃপায় একত্র মরবার সুযোগ পেলাম।

তাহারা আরও বলিল—বাংলা দেশের যেখানেই যাও এ সুযোগ মিলবে না।

বাঘটা গর্জ্জন করিয়া বলিল—হুঁ!

রাম ও রহিম আবার বলিল—সুন্দরবনই প্রকৃত ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র! এখানে হিন্দু মুসলমানে ভেদ নাই, এমন কি সাহেবী পোষাকেরও খাতির করে না!

বাঘটা আবার গর্জ্জন করিল—হুঁ!

পাঠক তুমি ভাবিতেছ যে বাঘে ধরিলে এত কথা বলিবার সুযোগ পাওয়া যায় না। এবিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা পরোক্ষ হইলেও কথাটা মানি। কিন্তু গল্প শেষ না হইলে নায়ক মরিতে পারে না। এবিষয়ে লেখক দক্ষিণ-রায়ের চেয়েও অনেক বেশি নিষ্ঠুর।

রাম ও রহিম অন্তিম ঐক্যতানে বলিয়া উঠিল—জয় বাবা দক্ষিণরায়! একত্র মরবার সুযোগ দিলে। দিন দিন তোমার রাজ্যের আয়তন ও শ্রীবৃদ্ধি হোক বাবা।—বলিয়া অচ্ছেদ্য বন্ধন রাম ও রহিম এক সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। মৃত্যুর পরে তাহারা একস্থানে গেল কিনা বলিতে পারি না।

# ভারতীয় নৃত্য ও ভারতীয় ব্যাঘ্র

হালুম

হলুম

... ... ...

—ভায়া আজকে একবার গাঁয়ের দিকে যাবে নাকি ?

—কেন, কিছু আছে নাকি ?

—আজ যে ওখানে মস্ত আসর, প্রকাণ্ড জলসা হবে।

—তাই নাকি ? অনেক লোক আসবে নিশ্চয়।

—আসবে না ? দশ গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়বে।

—তবে তো আমাদেরও যেতে হয়।

—সেই জন্যই তো এলাম তোমার কাছে। ভাবলাম, একবার যাই ভায়ার কাছে, দেখি যায় কি না। একলা যাওয়া কিছু নয়, যে দিনকাল পড়েছে।

উত্তম। নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু এত তাড়া কিসের ? রাত দশটার আগে নিশ্চয় গান আরম্ভ হবে না।

—তা আর হয় কি করে ?

—এবারে বলো দেখি ভাই কে কে আসছে ?

—অনেকেই আসছে। কলকাতার প্রসিদ্ধ ড্যান্সার শশিমুখী ( উচ্চারণ সসি মুখী ) আসছে বলে শুনেছি।

—তাই লাকি ? ( মুখে রসাধিক্যে 'ন'টা 'ল' হইয়া গেল। )

—তাই তো শুনলাম।

—তবে ভাই আমি তাকে লিব। ( পূর্বোক্ত কারণে ন—ল )

—সে কি করে হয় ? গতবারেও তুমি রাজুবালাকে নিয়েছিলে।

—সে সব পুরানো কথা ছেড়ে দাও, তা ছাড়া সে ছিল বুড়ো হাবড়া। শশিমুখী বড় কচি মেয়ে।

—আচ্ছা এক কাজ করা যাবে। দু'জনে না হয় তাকে ভাগে নিলেই হবে।

—সে মন্দ নয়।

এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয় ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, লেখক এসব কি নীতি-বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে। তাই বলিয়া রাখি, যাহাদের মধ্যে আলাপ চলিতেছিল তাহারা মানুষ নয়, দুটি ব্যাঘ্র। মহাক্ষুধা ও বহুক্ষুধা নামে দুটি সুন্দরবনের বাঘের মধ্যে পূর্বোক্তরূপ কথা হইতেছিল। সুন্দরবনের নিকটবর্তী একটি গ্রামে আজ জলসা হইবে, কলিকাতা হইতে অনেক গায়ক ও নর্তকী আসিবার কথা। তাহাদের মধ্যে শশিমুখী প্রধানা, সে প্রসিদ্ধ ড্যান্সার—ভারতীয় প্রথার নৃত্য দেখাইয়া সে বহু পদক পাইয়াছে। পদক-গুলি গলায় ঝুলাইয়া যখন সে আসরে অবতীর্ণ হয়—তখন তারকারাজি পরিবৃতা শশীর মতোই দেখায়। তা ছাড়া, পায়ে তাহার ঘুঙুর পরিবার প্রয়োজন হয় না, বুকের পদকরাজি নাচের তালে তালে পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি করিয়া গানের সঙ্গে সঙ্গৎ করিতে থাকে।

তখন মহাক্ষুধা ও বহুক্ষুধা সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইল, রাত্রি দশটার সময়ে গ্রামের দিকে গেলেই চলিবে তাহারা স্থির করিল।

গানের আসর অনেকক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। মহাক্ষুধা ও বহুক্ষুধা সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়া একটি মৃগের পিছন লইয়ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি মায়ামৃগে পরিণত হওয়ায় তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইল। কিছু বিলম্বও ঘটিল। তাহারা আসরের কিছু দূরে অন্ধকারে একটি ঝোপের আড়ালে আসিয়া বসিল। তাহারা আসরের দিকে তাকাইয়া দেখিল মজলিসের মধ্যখানে কি একটা অপূর্ব-পরিচয় জানোয়ার বিকট লাফালাফি করিতেছে। কখনো মনে হইতেছে তাহাব চারটা পা, কখনো মনে হইতেছে তাহার পা নাই, চারখানাই হাত, আবার কখনো বা মনে হইতেছে তাহার হাত পা কিছুই নাই. সবটাই ধড়! তাহারা ভাবিতে লাগিল—ও বাবা, এ কি রকম জানোয়ার!

মহাক্ষুধা শুধাইল—ভায়া, এ কোথায় আনলে? ওটা কি জানোয়ার?

বহুক্ষুধা বলিল—তাইতো! শশিমুখী কোথায়?

মহাক্ষুধা বলিল—ভায়া, মজা দেখেছ. এতগুলো মানুষ ঐ জানোয়ারটার ভয়ে চুপ করে ব'সে আছে, মুখে টুঁ শব্দটি নাই।

বহুক্ষুধা বলিল—ওরা পালায় না কেন?

মহাক্ষুধা—এ আর বুঝলে না? আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে পড়লে হরিণগুলো যেমন পালাতে পারে না, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়, মানুষগুলোরও তেমনি দশা হয়েছে।

বহুক্ষুধা—চলো, সরে পড়ি।

মহাক্ষুধা—তাহ'লে শশিমুখীর আশা ছাড়তে হ'ল।

বহুক্ষুধা—আরে প্রাণ থাকলে অনেক শশিমুখী মিলবে।

তাহারা ফিরিবে ফিরিবে করিতেছে এমন সময়ে সেই অদ্ভুত জন্তুটা সর্বাঙ্গ তুলিয়া এমন বিকট ঝম্প মারিল যে, ভীত সন্ত্রস্ত ব্যাঘ্রদ্বয় লেজ তুলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল—শশিমুখীর কথা একবারও মনে হইল না।

মহাক্ষুধা ও বহুক্ষুধা অকারণে পলাইল। তাহারা নিতান্ত জানোয়ার না হইয়া রসজ্ঞ মানুষ হইলে বুঝিতে পারিত, যাহার আশায় তাহারা আসিয়াছিল ঐ প্রাণীটিই সেই প্রসিদ্ধ ড্যান্সার শশিমুখী !

শশিমুখী ভারতীয় নৃত্য করিতেছিল।

# শাপ মুক্তি

সাহিত্যিক অমরনাথ একজন শাপভ্রষ্ট দেবতা। সকলে তাহাকে সুবিখ্যাত কথাশিল্পী বলিয়া জানে, কিন্তু গত জন্মে সে অমরবৃন্দের অন্যতম ছিল লোকে আর কেমন করিয়া জানিবে? আজ সেই কথাই বলিব আর ঐ কথার সূত্রেই পরবর্ত্তী রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন হইবে।

দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় উর্ব্বশী তখন নৃত্য করিতেছিল, সভার এক প্রান্তে বসিয়া একজন minor দেবতা (তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রত্যেকেরই হয় তো একটি করিয়া নাম আছে, কিন্তু শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ না থাকায় বলিতে পারিলাম না) এমন ভাবে উর্ব্বশীর মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল যে তাহাকে কেবল শিল্প-রস পিপাসা বলা যায় না। সহসা উক্ত দেবতার প্রতি ইন্দ্রের দৃষ্টি পড়িল। প্রথমে তিনি বিস্মিত হইলেন, তৎপরে রুষ্ট হইলেন, শেষে বলিলেন, ভো যুবক! তোমার স্পর্দ্ধা সত্যই অসহ্য! এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে, অতএব মর্ত্ত্যধামে গিয়া তুমি সাহিত্যিক রূপে জন্মগ্রহণ করো।

তখন উক্ত দেবতা কাঁদিয়া দেবরাজের পায়ে পড়িল, বলিল, প্রভু মার্জ্জনা করো।

দেবরাজ বলিলেন, এখন মনটা শান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি নিরুপায়, যে আদেশ একবার বাহির হইয়াছে, তাহা অন্যথা হবার নয়।

—তবে আমার শাপমুক্তি হইবে কিরূপে ?

দেবরাজ বলিলেন—আমিই তাহার ব্যবস্থা করিব। এখন তুমি মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হওগে।

সেই শাপভ্রষ্ট অমরনাথ দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। সাহিত্যিক জীবনের যাহা কিছু কাম্য, বাড়ি, গাড়ি, দ্বারী, নারী, প্রভৃতি সবই তাহার জুটিয়াছে, এমন কি সে খানকতক পুস্তকও লিখিয়া ফেলিয়াছে। লোকে তাহাকে বড়ই মানে, একে সাহিত্যিক তার উপরে সুপুরুষ, তার উপরে উজ্জ্বল টাক সমন্বিত এবং টাকের উপরে একটি আঁচিল—না মানিয়া উপায় কি ?

একদিন সকালবেলায় অমরনাথ বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল এমন সময়ে এক ভদ্রলোক প্রবেশ করিল।

অমরনাথ শুধাইল—কি চাই।

ভদ্রলোক বলিল—আপনাকে দর্শন করাই উদ্দেশ্য, তবে ঐ সঙ্গে একটি লেখাও চাই।

তারপর একটু সলজ্জ হাসিয়া বলিল—একখানা পূজা-সংখ্যা বের করছি কিনা!

অমরনাথ ক্ষিপ্ত হইয়া লাফাইয়া উঠিল—বলিল, বের হও।

পাঠক, তুমি ভাবিতেছ, অমরনাথের একি ব্যবহার। কিন্তু সমস্ত ইতিহাস জানিলে তুমি নিশ্চয় তাহাকে দায়ী করিবে না

আজ এক মাসের মধ্যে ৩৭০ জন লোক তাহার কাছে পূজা-সংখ্যার লেখার উমেদারিতে আসিয়াছে। অমরনাথ অনুদার নয়, মানুষে যাহা সম্ভব সে করিয়াছে, একমাসে ৩৫০টি লেখা সে ছাড়িয়াছে, অবশ্য সবগুলি নিজে লেখে

নাই. শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা কবে সব লেখা নিজেরা লেখে! অধিকাংশ রচনাই ছেলেমেয়ের স্কুলের খাতা ও গৃহিণীর হিসাবের খাতা হইতে গৃহীত, অমরনাথ কেবল নিজের নামটি সহি করিয়া দিয়াছে। তোমরা ভাবিতেছ কেহ ধরিতে পারিল না? ধরিতে পারা দূরে থাকুক—ঐগুলিই লোকের বেশি ভাল লাগিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে, কেমন স্বাভাবিক! কিন্তু এখন সত্যই আর অসম্ভব। কারণ গৃহিণীর হিসাবের খাতায় আর পাতা নাই, ছেলেমেয়েদের পুরাতন খাতা ফুরাইয়া গিয়াছে—আর অমরনাথের স্বকীয় আঙ্গুলগুলি বাতের ব্যথায় এমন বাঁকিয়া গিয়াছে যে কলম দূরে থাকুক—স্বর্ণ মুদ্রাও ধরিতে অক্ষম! এইবারে, পাঠক, অমরনাথের উষ্মার কারণ বুঝিতে পারিবে।

অমরনাথের উষ্মায় তুমি বিচলিত হইলেও উক্ত ভদ্রলোক বিচলিত হইবার কোন লক্ষণ দেখাইল না, কেবল বলিল, আপনার অসুবিধা জানি স্যর—সেই জন্যই তো আগে আসি নি!

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—অন্য সংখ্যা হ'লে আসতামই না—কিন্তু এটা পূজা-সংখ্যা কি না।

অমরনাথ তাহার ধীরতা দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি জোচ্চোর।

মনে আশা ছিল লোকটা অপমানিত বোধ করিয়া সরিয়া পড়িবে কিন্তু সেরূপ কিছুই হইল না। কেবল সে বলিল, পূজা-সংখ্যা যখন বের করছি—জোচ্চোর বই আর কি!

তারপরে বলিল—আচ্ছা এখন যাই, ও বেলা একবার আসবো।

এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

অমরনাথ দারোয়ানের প্রতি আদেশ করিল—কোই সম্পাদককে মৎ ঘুঁসনে দেও।

দারোয়ানজি লম্বা সেলাম করিয়া বলিল—জি হুজুর!

—চাই ভালো ভালো আপেল, নাসপাতি, পেয়ারা—

—এই ফলওয়ালা ভিতরে এসো, অমরনাথ ডাকিল।

চাপদাড়িওয়ালা এক ফলবিক্রেতা ভিতরে ঢুকিল।

—কি রকম দাম?

—সে জন্য আপনি ভাববেন না।

—বেশ।

অমরনাথ কিছু ফল বাছিয়া লইল, বলিল, কত দেবো?

ফলওয়ালা বলিল—দাম দিতে হবে না, পূজা-সংখ্যার লেখাটি দিলেই চলবে।

—পূজা-সংখ্যার লেখা? তুমি তো ফল বিক্রি করো।

—আজ্ঞে না, আমি 'নূতন বঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক, সকালবেলা আপনার কাছে এসেছিলাম।

—তবে এ বেশ কেন?

—আজ্ঞে, আপনি দারোয়ানকে হুকুম দিয়েছেন, সম্পাদকদের ঢুকতে নিষেধ ক'রে—তাই এই পন্থা।

—জোচ্চোর, বের হও।

অগত্যা ফলওয়ালা সওদা লইয়া বাহির হইয়া গেল। বিস্মিত ভীত অমরনাথ একাকী বসিয়া রহিল।

বিকালবেলা অমরনাথ একটি বিখ্যাত ভোজনালয়ে চা পান করিতে যাইত। আজিও গেল। চা পান শেষ করিল। বেয়ারা বিল আনিল। অমরনাথ বিলটি তুলিয়া দেখে লিখিত আছে—দামের পরিবর্তে লেখাটি দিলেই চলিবে। আমিই সেই সম্পাদক। আপনার এখানে আসা অভ্যাস জানি, তাই এই পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি—ত্রুটি মার্জনীয়।

ক্রুদ্ধ, ভীত অমরনাথ চা এর দাম না দিয়াই ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং সম্মুখে যে ট্যাক্সিখানা দেখিতে পাইল তাহাতেই চাপিয়া বসিল—বাড়ির ঠিকানা বলিয়া গাড়ির মধ্যে শুইয়া পড়িল।

গাড়ি ঠিকানায় আসিয়া থামিলে অমরনাথ নামিয়া ভাড়া চুকাইবার উদ্দেশ্যে পকেটে হাত দিতেই ড্রাইভার বলিল-- ভাড়া চাই না।

—তবে ?

—নূতন বঙ্গের জন্য লেখাটি !

—তুমি কে ?

—আমি নূতন বঙ্গের সহকারী সম্পাদক।

—ওরে এরা সবাই ডাকাত, বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে অমরনাথ ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

অমরনাথের স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া বলিল— কি হয়েছে ?

—শরীর বড় খারাপ।

—আহা ! হবেই তো, কেবলি বাইরে ঘুরে বেড়ানো—স্নেহময়ী পত্নী স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, তারপরে বলিল—না, কিছুই হয়নি। দেখো, এক কাজ করো, আজ সন্ধ্যাবেলায় একটি ভদ্র মহিলা এসেছিলেন।

—কে ?

—নূতন বঙ্গ সম্পাদকের স্ত্রী।

অমরনাথ মূর্চ্ছিত হইল। যখন তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, দেখিল যে পাড়ার ডাক্তার পাশে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার বলিলেন, ভয়ের কিছু নেই। ঔষধ পাঠিয়ে দেবো, খেলেই রাত্রিটা ঘুম হবে। কা'ল সকালে উঠে লেখাটা লিখে ফেলবেন।

—লেখা ? কোন্ লেখা ?

—ঐ যে কি বলে নূতন বঙ্গ না কি ? সম্পাদক এসে আমাকে ধরেছিলেন আপনাকে request করবার জন্যে—

অমরনাথ আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছার মধ্যে সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যে দেবরাজ ইন্দ্র আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—বৎস, তুমি পূর্বকথা বিস্মৃত হইয়াছ। তুমি ছিলে দেবতা।

আমার শাপে এখন সাহিত্যিক অমরনাথ। তোমার শাপমুক্তির জন্যই আমি নূতন বঙ্গ সম্পাদককে পাঠাইয়াছি—সেও একজন শাপভ্রষ্ট দেবতা। কাজেই তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন তাহার কবল এড়াইতে পারিবে না।

অমরনাথ বলিল—প্রভু, তাহাকে কি লেখাটা দেবো?

দেবরাজ বলিলেন—শুধু লেখা দিলে সে সন্তুষ্ট হইবে না, তোমার প্রাণটা লইবার জন্য তাহার উপরে জরুরি আদেশ আছে!

অমরনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিল সমস্ত গা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

একি দুঃস্বপ্ন! মরিতে হইবে! কেন মরিতে যাইব! ইন্দ্র না মাথা আর মুণ্ডু! পেট গরম হইলে ওরকম স্বপ্ন দেখা যায়। না, কখনই মরিব না! আসুক দেখি কে মারে? প্রভৃতি নানা কথা অমরনাথ ভাবিতে লাগিল।

ইহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে স্বর্গ যতই বাঞ্ছনীয় হোক তাহা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে দীন মর্ত্যধাম ছাড়িতে কেহ রাজি নয়। মরিবার পরে স্বর্গে যাইতে অনেকেরই আপত্তি থাকে না—কিন্তু সে মরিবার পরেই। তখন আর অন্য গতি নাই বলিয়া।

অমরনাথ ভাবিল আজ সারাদিন স্নানের ঘরে ঢুকিয়া বসিয়া থাকিবে, দেখি কিরূপে সম্পাদক প্রবেশ করে! সাবধানের মার নাই।

সে স্নানের ঘরে ঢুকিয়া উত্তমরূপে ভিতরে বাইরে তালা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া রহিল। এবারে নিশ্চিন্ত। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় নাই, কিছু-ক্ষণের মধ্যেই তাহার ঘুম আসিল, সে মেঝের উপরই শুইয়া পড়িল।

হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিলে সে দেখিল সম্মুখে জীবন্ত কৃতান্তের মতো নূতন বঙ্গ সম্পাদক দণ্ডায়মান।

অমরনাথ শুধাইল—তুমি কোথায় ছিলে?

সম্পাদক বলিল—ঐ পুরাতন Bath tub-টার মধ্যে।

—কেন?

—অন্যত্র তোমার সঙ্গে দেখা হয় না বলে।

—কি ভাবে জানলে এখানে আমি ঢুকবো।

—আমিও যে শাপভ্রষ্ট দেবতা, অন্তর্যামিত্তা গুণ এখনো কিছু কিছু আছে।

অমরনাথ বলিল—কি চাই ? পূজাসংখ্যার গল্প ?

সম্পাদক বলিল—সেটা তো ছল মাত্র, আমি চাই তোমার প্রাণ।

—কেন ?

—কাল রাত্রের স্বপ্নের কথা ইতিমধ্যেই ভুলে গেলে ?

—স্বপ্ন আবার সত্য হয় ?

—তবে এখানে ঢুকেছিলে কেন ?

—পেট গরম হলে ও রকম স্বপ্ন দেখা যায়।

—এখনি পেট কেন সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে! যাই হোক, প্রস্তুত হও, তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আমার উপরে জরুরি আদেশ আছে, না পারিলে আমার বেতন কর্ত্তন হইবে।

এই বলিয়া সম্পাদক সাহিত্যিকের গলা টিপিয়া ধরিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে অমরনাথ অমরধামে চলিয়া গেল। তাহার শাপমুক্তি ঘটিল।

অবশ্য সম্পাদক নিজেও একজন শাপভ্রষ্ট দেবতা। কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া সেও অন্তর্দ্ধান করিল।

সন্ধ্যাবেলা অমরনাথের স্ত্রী পুনঃ স্নানের ঘরে ঢুকিলে দেখিল অমরনাথের দেহ ভূলুণ্ঠিত।

ডাক্তার আসিল, নাড়ী টিপিয়া বলিল—অনেকক্ষণ হ'য়ে গিয়েছে, তারপরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—অ্যাপোপ্লেক্সির ষ্ট্রোক!

বাহির হইয়া যাইবার সময়ে সহৃদয় ডাক্তার অমরনাথের স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলিল—যা হ'বার হয়েছে, তার তো উপায় নেই। দেখবেন তো ওঁর কাগজ পত্রের মধ্যে কোন অপ্রকাশিত গল্প আছে কিনা? আমি এক-খানা পূজা-সংখ্যা বের করছি কিনা!

স্ত্রী বলিল—থাকলে আপনাকে দেবো কেন?

—নয় কেন ?

—আমি নিজেও যে একখানা পূজা-সংখ্যা বের করবো ভাবছি।

পুত্র বলিল—মা, এ তোমার অন্যায়, আমার সঙ্গে কমপিটিশন করা তোমার উচিত নয়। গল্পটা আমাকে দিও, আমিও যে একখানা বের করছি।

তখন তিনজনে গিয়া অমরনাথের ডেস্কের কাগজপত্র ঘাঁটিতে আরম্ভ করিল। কিছুই পাইল না। অনেকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটির পরে এক টুকরা চিরকুট পাইল, তাহাতে লেখা আছে—ডেস্ক ঘেঁটে একটি লেখা পেলাম, নিয়ে গেলাম, পূজা-সংখ্যা বের ক'রে তা'তে প্রকাশ করবো। দক্ষিণা থেকে আমার দু'মাসের প্রাপ্য বেতন কেটে নিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তা আপনাদের পাঠিয়ে দেবো। ইতি রসধর।

ডাক্তার শুধাইল—রসধর কে ?

—আমাদের পুরানো চাকর।

—হাউ লাকি !

ডাক্তার সিগারেট ধরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

# রাঘব বোয়াল

১

অবশেষে ওঙ্কারনাথ স্থির করিয়া ফেলিল যে, অতঃপর সে চুরি করিবে। সিদ্ধান্তটি শুনিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার মধ্যে কত যুগ-যুগান্তরের সংস্কার সঞ্চিত, কত মনীষী মহাপুরুষের নিষেধ পুঞ্জীভূত, কত বিধি বিধান, কত আইন-আদালত—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কাজেই সে দিক দিয়া বিচার করিলে ওঙ্কারনাথের সিদ্ধান্তটি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে না।

অবশ্য হঠাৎ সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় নাই; তাহাকে বাহ্য এবং আন্তর অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। খুলিয়া না বলিলেও তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন নয়।

ইহার পরেও যদি, পাঠক, তুমি আরও বিশদ ব্যাখ্যা চাও, তবে বলিব, ব্যাখ্যা বাহিরে খুঁজিবার কি প্রয়োজন, নিজের মনের মধ্যে সন্ধান কর না কেন! কখনও কি তোমার চুরি করিতে ইচ্ছা হয় নাই? ভয় নাই, আমি উত্তর দাবি করিব না, কিন্তু নিজের কানে কানে একবার—অন্তত একবারও সত্য কথা বল দেখি! যখন দেখিয়াছ যে, তোমার চেয়ে স্বল্পতর বেতনের লোকটির বাড়ি তৈয়ারি হইল, আর তুমি আজও ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস-

করিতেছ ; মাসের শেষে খরচের টানাটানিতে গৃহিণীর মুখচন্দ্র যখন রাহুগ্রস্ত হইয়াছে, তোমার নিম্নতম কর্মচারী যখন তোমাকে ডিঙ্গাইয়া তর্‌তর্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল ; ক্রমবর্ধমান দুহিতার বয়স যখন বিবাহের সীমানা অতিক্রম করে-করে ; পুত্রকে একবার শুধু বিলাত ঘুরাইয়া আনিতে পারিলেই মোটা বেতনের চাকুরিটা তাহার করায়ত্ত হইয়া যায় ; তৃতীয় শ্রেণীর রেল গাড়িতে যখন দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম ; আর শীতের রাত্রের খাটো লেপের মত সংকীর্ণ বেতনে যখন মাথা ও পায়ের একদিক অনাচ্ছাদিত রহিয়া যায় ; তখন কি কখনও মনে হয় নাই—দূর ছাই, ও-সব নীতিকথার রাবিশে কি পেট ভরে ? এবারে অমুকবাবুর মত চুরি করিব। কিন্তু জানি, তোমার সেই ক্ষণিক ইচ্ছা সিদ্ধান্তে পরিণত হয় নাই। ওঙ্কারনাথের হইয়াছে, কেন না, পাঠক তুমি লেখকের মতই একজন সাধারণ মানুষ—আর ওঙ্কারনাথ একজন মহাপুরুষ, ক্ষণকালের পদ্মপত্র ক্ষণজন্মাপুরুষ, টলমল করিয়াও দিব্য টিকিয়া আছেন, পড়ি-পড়ি করিয়াও পড়িবার নাম করেন না।

তবে এক জায়গায় তোমার আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওঙ্কারনাথের অভিজ্ঞতার মিল আছে, সেটা একেবারে মূলগত। যে সব কারণে তোমার কখনও কখনও চুরি করিতে ইচ্ছা করে, ওঙ্কারনাথের জীবনেও সে সমস্তই ঘটিয়াছে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাহার ইচ্ছার পশ্চাতে প্রত্যয় আছে, জ্ঞানের পশ্চাতে কমস্পৃহা আছে, এবং এরূপ মণিকাঞ্চন যোগাযোগের ফলে ওঙ্কারনাথ স্থির করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে চুরি করিবে।

চুরি করিবার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যেসব যুক্তি আছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস সেগুলি অনেকবার মনে মনে সে আলোচনা করিয়াছে, এমন কি লিখিত আকারে সম্মুখে রাখিয়াও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে যে চুরি না করিবার পক্ষে একটি মাত্র যুক্তি—কোন কোন শাস্ত্রের ও তথাকথিত মহাপুরুষের নিষেধ, আর স্বপক্ষে যুক্তির অন্ত নাই। আর কোন কারণে না হোক, নিছক ভোটের জোরেও চুরির স্বপক্ষগণের জিতিয়া যাইবার সম্ভাবনা। চুরির স্বপক্ষ

ও বিপক্ষ যুক্তির একটি তালিকা আমরা উদ্ধার করিয়া দিলাম। একবার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সমস্ত সমস্যাটি জলের মত সহজগ্রাহ্য হইয়া আসিবে—এবং চাই কি, পাঠক, অভীষ্ট মত সংগঠনে তোমাকে কিছু সাহায্য করিলেও করিতে পারে।

## কেন চুরি করিব

১। সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে চুরি করিতেছে।

২। সার্থক চোরকে কেহ নিন্দা করে না, বরঞ্চ তাহার সামাজিক মান-মর্যাদার অভাব হয় না।

৩। চুরি না করিলে আদর্শবাদ দূরে থাকুক, সংসারও চলে না।

৪। চুরি না করিলে গৃহিণী কাপুরুষ, বন্ধুরা ভণ্ড এবং ভৃত্যগণ বেকার মনে করিবে।

৫। চুরি না করিয়া এ পর্যন্ত কেহ বড় হয় নাই।

৬। ধরা না পড়িলে চুরির মত ধনাগমের সহজ পন্থা আর নাই।

৭। তুমি সাধু বলিয়া কেহ তোমার অভাবে সাহায্য করিবে কি ?

৮। ঐ অমুকবাবু একজন বনেদী চোর—তাঁহার মান-মর্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা কাহার-চেয়ে কম ?

৯। যেখানে সকলেই চোর, সেখানে চুরি না করা এক প্রকার সমাজদ্রোহিতা।

১০। আমার অভাব, ধনীর অতিরিক্ত,—চুরির ক্ষেত্র বলিতে গেলে স্বয়ং ভগবানই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

## কেন করিব না

১। শাস্ত্র বলিয়া কথিত কোন কোন গ্রন্থের এবং মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত কোন কোন মানুষের নিষেধ।

°। চুরি করিবই করিব। তবে কাজটা আইন বাঁচাইয়া করিতে

হইবে। তবে সেটাও প্রথম দিকে, পরে জানাজানি হইয়া গেলে, সার্থকনামা চোর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে সেটুকু কষ্ট করিবারও আর প্রয়োজন হইবে না।

ইহাই সংক্ষেপে ওঙ্কারনাথের সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত যুক্তি ও বিশ্লেষণ।

২

আজ ওঙ্কারনাথের জীবন-ক্যালেণ্ডারে নূতন তারিখ লাল কালিতে ছাপা। আজ হইতে সে চুরি শুরু করিবে, ওসব আদর্শবাদের ধাপ্পা আর নয়, গুডবাই টু অল ছাট।

আইনসঙ্গত চুরির নিরাপত্তম উপায়--ধার করা। প্রয়োজন হইলে ধার অনেকেই করে, শোধ করিয়াও দেয়, অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধার করিবার সময়ে শোধ করিবার ইচ্ছা মনে থাকে। সে ধার স্বতন্ত্র জাতের। এ ধার অন্য বস্তু। গোড়া হইতেই সঙ্কল্প—ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। আইনের ভয় নাই, ঐটুকু ছাড়া ও এক রকম পকেট-কাটাই বটে।

ওঙ্কারনাথ স্থির করিল অধস্তন কর্মচারীর নিকটে ধার করিতে হইবে; সহসা ফিরিয়া চাহিতে পারিবে না।

ওঙ্কারনাথ যথাসময়ে আপিসে গেল। আপিস ছুটি হইবার সময়ে অধস্তন এক কর্মচারীকে নিভৃতে ডাকিয়া হঠাৎ দরকার পড়িয়াছে বলিয়া একশো টাকা চাহিল, (অনভ্যাসবশত গলাটা একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল, কিছুদিন পরে আর যাইবে না।) বলিল, মাসের প্রথমেই—

কর্মচারীটি বাধা দিয়া বলিল, সে জানি।

কর্মচারীটি নিজের অভূতপূর্ব সৌভাগ্যে খুশি হইয়া হেড দরোয়ানের নিকট হইতে টাকাটা চাহিয়া আনিয়া ওঙ্কারনাথের হাতে দিল।

ভাগ্যের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রথম রাউণ্ডে এইভাবে জয়ী হইয়া প্রসন্ন মনে ওঙ্কারনাথ বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাড়িতে ঢুকিয়াই ওঙ্কারনাথ দেখিল, স্ত্রীর মুখখানি বড় হাসি হাসি।

ব্যাপার কি ?

তুমিই অনুমান কর দেখি !

আমি কি জানি !

জানিই হও, আর জানোয়ারই হও, আর মানুষই হও, কখনই বলতে পারবে না।

তা হ'লে আর জিজ্ঞাসা কর কেন ? নিজেই বল।

আজ তোমার আপিসের সাহেবের ( মানে অফিসার বড় হইলেই সাহেব, সাদা চামড়া হইবার প্রয়োজন সব সময়ে হয় না ) স্ত্রী এসেছিলেন।

মিসেস বোস ?

হ্যাঁ গো।

তিনি তো কখনও কারও বাড়ি, বিশেষ অধস্তন অফিসারের বাড়ি যান না !

তা নইলে আর সৌভাগ্য বলছি কেন ?

কোনও কাজ ছিল ?

আসল সৌভাগ্য তো এখনও বলি নি।

সেটা আবার কি ?

হঠাৎ দরকার পড়েছে ব'লে পাঁচশো টাকা চেয়ে নিয়ে গেলেন, বললেন, মাসের ঠিক প্রথমেই—

ওঙ্কারনাথ ধপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সেও তো টাকা ধার লইবার সময় ঠিক ওই আশ্বাসই দিয়াছিল, কাজেই ও-কথার দৌড় কতখানি তাহার চেয়ে বেশি কেহ জানে না।

কি গো, তোমার হঠাৎ কি হ'ল ?

না, কিচ্ছু না, বেশ আছি। এই বলিয়া ওঙ্কারনাথ একটু একাকী থাকিবার আশায় বাথ-রুমে গিয়া ঢুকিল।

চিন্তার এক চমকে চুরির সার্থকতা যেমন সে বুঝিতে পারিয়াছিল, চিন্তার আর এক চমকে তেমনি বুঝিতে পারিল ও-পথের সার্থকতা সকলের জন্য

নহে, কারণ তুমি যদি অপরের একশো টাকা চুরি কর, অপরে তোমার পাঁচশো টাকা চুরি করিতে পারে। ঘটিয়াছেও তাই।

তিমি যত বড়ই হোক, তিমিঙ্গিল তাহার চেয়েও বড়। তাহার চাইতেও অনেক বড় রাঘব বোয়াল। অতএব সংসারের আর দশটা দুর্গম পথের ন্যায় চুরির পথও নির্ব্বোধের পক্ষে সুগম নয়।

ওঙ্কারনাথ স্থির করিল যে, চুরি করিবে না। অধস্তন কর্মচারীর একশো টাকা মাসের প্রথমেই সে ফেরত দিয়াছে, যদিচ সাহেবের স্ত্রী টাকাটা এখনও ফেরত দিয়া যায় নাই। চুরি না করিবার পক্ষে আর একটি যুক্তি অভিজ্ঞতা হইতে সে খুঁজিয়া পাইয়াছে—

"সার্থকভাবে চুরি করিতেও বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে ও-পথে অগ্রসর হইও না, ঠকিয়া মরিবে।"

# ইয়াসিন শর্ম্মা এণ্ড কোং

ইয়াসিন ও গোপাল একেবারে পাঠশালার সহপাঠী। একই গ্রামের একই পাড়ায় দু'জনের বাড়ি। একই পাঠশালায় পড়িতে গিয়া দুজনের পরিচয়, দুজনে একই শ্রেণীর পড়ুয়া। সে পরিচয় এমনই পাকা হইয়া গেল যে তাহারা অচ্ছেদ্য হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে গ্রামের লোকের কাছেও তাহাদের ভেদ অচিন্তনীয় হইয়া উঠিল। গোপাল লুকাইয়া আসিয়া ইয়াসিনের বাড়িতে নাস্তা করিয়া যাইত, ইয়াসিন লুকাইয়া লুকাইয়া গোপালের বাড়িতে খাইয়া আসিত। সকলেই কথাটা কাণাঘুষায় জানিত, কিন্তু কিছু বলিত না, ভাবিত ছেলেমানুষে ছেলেমানুষি করেই, বয়স হইলে ওসব সারিয়া যায়।

কিন্তু সারিল না। পাঠশালা ছাড়িয়া তাহারা মধ্য ইংরাজি স্কুলে ঢুকিল, মধ্য ইংরাজি স্কুল হইতে মহকুমার উচ্চ ইংরাজি স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইল এবং অবশেষে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরস্বতীর সঙ্গে দেনা-পাওনা শোধ করিয়া তাহারা গ্রামে আসিয়া বসিল। ইয়াসিন হইল মধ্য ইংরাজি স্কুলের হেড মৌলবী আর গোপাল হইল হেড পণ্ডিত। কালে কালে গ্রামের অনেক কিছুই বদল হইল, অনেক কিছুই জীর্ণ হইল কিন্তু তাহাদের বন্ধুত্বের না হইল বদল, না হইল তাহা জীর্ণ।

অনেক আগের কথা। তখন তাহারা মধ্য ইংরাজি স্কুলের ছাত্র, একবার এক স্বদেশী নেতা গ্রামে আসিলেন, তিনি ইয়াসিন ও গোপালের বন্ধুত্বের বিবরণ শুনিয়া দুইজনকে কোলের উপর বসাইয়া নিজের একখানা ছবি তুলাইয়া লইলেন, সকলকে বলিলেন, এক দেশে বাংলা মায়ের কোলে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই।

ইয়াসিন ও গোপালের আরও একটা বিষয়ে মিল ছিল—তাহারা কেহই বিবাহ করিল না। তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া হিন্দুরা বলিত, কে বলে হিন্দু-মুসলমানে মিল হয় না। মুসলমানেরা বলিত কে বলে মুসলিম-হিন্দুতে অবনিবনাও! এইভাবে চলিতেছিল, এমন কি মুসলিম লীগের হাতুড়ির আঘাতেও তাহাদের বন্ধুত্ব অটল রহিয়া গেল। হয়তো শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিত। কিন্তু এমন সময়ে বাংলাদেশের বুক চিরিয়া র‍্যাডক্লিফের ছুরি চলিয়া গেল। আর অমনি পূর্ব্বাঞ্চলের হিন্দুরা পশ্চিমাঞ্চলে আর পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানরা পূর্ব্বাঞ্চলে স্থান বদল করিতে সুরু করিয়া দিল।

ইয়াসিন ও গোপালের গাঁয়ের নাম নিয়ামৎপুর। নিয়ামৎপুরেও সে ঢেউ আসিয়া উপস্থিত হইল। অনেক হিন্দু চলিয়া গেল, অনেক মুসলমান আসিল, তার মধ্যে আসিল কয়েকঘর অবাঙ্গালী মুসলমান।

ইয়াসিন গোপালকে বলিল, দোস্ত, আমরা যাবো না।

গোপাল বলিল, ভাই, তুমি থাকিতে আমার ভয় কি!

কিন্তু সংসারের সবাই ইয়াসিন নয়, সবাই গোপালের বন্ধু নয়।

মাঝে মাঝে এখন গোপালের খামারে গরু ঢুকিয়া পড়ে, মাঝে মাঝে গোপালের বাড়ীর সম্মুখে হামলা সুরু হইয়া যায়। গোপালের টিনের বাড়িখানা পাইলে অবাঙ্গালী মুসলমানদের পুনর্ব্বসতি ব্যাপারের একটা সুরাহা হয়।

অবশেষে পাটনা জেলার এক মুসলমান ইয়াসিনকে বলিল, হিঁদুর সঙ্গে দোস্তি করিলে গুণা হয়।

একজন হিন্দু আসিয়া গোপালকে বলিল, ভাই, আর কেন, এইবার চলো পালাই।

কিন্তু ইয়াসিন ও গোপাল অটল রহিল।

জগন্নাথপুরে বড় হাট। সেদিন হাট সারিয়া সন্ধ্যার পরে গ্রামে ফিরিয়া গোপাল দেখিল যে পাটনা জেলার সেই মুসলমান গোপালের বাড়ি জবর দখল করিয়া তাহার শয়ন ঘরের বারান্দায় বসিয়া সজোরে আরবি গ্রন্থ পাঠ করিতেছে, বোধ করি ধর্ম্মশাস্ত্রই হইবে।

সেই রাত্রেই ইয়াসিন ও গোপাল গোপনে গ্রামত্যাগ করিল।

২

তাহারা স্থির করিল দুজনে একত্র পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিবে। কিন্তু উভয় বঙ্গের সীমানার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিলে নানা রকম গুজব তাহাদের কানে প্রবেশ করিল।

আগন্তুক মুসলমানগণ বলিতেছে, সর্ব্বনাশ পশ্চিমবঙ্গে গেলে কি আর বাঁচিবে! সেখানকার সব মুসলমান একমাস পূর্ব্বে নিকাশ হইয়া গিয়াছে।

নিতান্ত গ্রাম্য বলিয়াই গোপাল ও ইয়াসিনের বুদ্ধি হইল না যে জিজ্ঞাসা করে—তবে তাহারা এ পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিল কি প্রকারে?

গোপাল বলিল, চলো, আগে সীমানা পর্য্যন্ত যাই তো। তারপরে মরিতে হয় দুজনে একত্র মরিব।

পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা উভয় বঙ্গের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সীমান্ত বলিতে খাল বিল নদীনালা পাহাড় প্রাচীর কিছুই নয়, কিন্তু বুঝিতে ভুল হয় না; এদিকে নীল পাগড়ি পরিহিত পুলিশ; ওপারে লাল পাগড়ি পরিহিত পুলিশ, এদিকে আনসার, ওদিকে জনতা, আর উভয় পক্ষের মধ্যে যে ভাষাবিনিময় চলিতেছে তাহা যেখানে মানুষের প্রতি প্রযুক্ত হয় সেখানে সীমানা নির্দ্দেশের জন্য পাহাড় বা নদীনালার আর প্রয়োজন করে না।

ইয়াসিন একজন আন্সারকে বলিল—ভাই, সীমানা চিহ্নটা কই ?

কথিত আন্সার তাহার হাতে একটা আতস কাঁচ দিয়া বলিল, "থোড়া আগে আঁখসে দেইখ্যা লও।"

নির্ব্বোধ ইয়াসিন বুঝিতে পারিল না যে কেবল ভূখণ্ডে মাত্র নয়, ইতিমধ্যে ভাষার বুক চিরিয়াও ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে।

সে আগাইয়া গিয়া আতস কাঁচ সহযোগে মাটীতে একটি অতি সূক্ষ্ম রেখা আবিষ্কার করিল। ইহাই বহু কথিত র‍্যাডক্লিফি সীমানা চিহ্ন।

গোপাল বলিল - ভাই, তোমাকে ও পাশে লইয়া যাইতে ভয় করি।

ইয়াসিন বলিল—ভাই, তোমাকে এ পাশে রাখিতে ভয় করি।

তখন দুজনে একটি জম্বুবৃক্ষ তলে উপবেশন করিয়া কি ভাবে একত্র থাকিয়াও নিরাপদে থাকা যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

অবশেষে উপায় আবিষ্কৃত হইল। উক্ত সীমানা চিহ্নের ঠিক পশ্চিম গা ঘেঁষিয়া গোপালের এবং ঠিক পূর্ব্ব গা ঘেঁষিয়া ইয়াসিনের কুটীর উঠিল। বাস্ এবার তাহারা যুগপৎ সুরক্ষিত ও সম্মিলিত। ইয়াসিনের কুটীর ঘেরিয়া আন্সার দাঁড়াইল, গোপালের কুটীর ঘেরিয়া জনতা দাঁড়াইল—দুই দল সমস্বরে বলিয়া উঠিল—হুঁসিয়ার, কাছে আসিও না।

গোপাল ও ইয়াসিন মাঝখানে সেই অদৃশ্যপ্রায় চিহ্নটি রাখিয়া পাশাপাশি বসিয়া গল্প করে, তামাকের কল্কে বিনিময় করে, অথচ তবু কেমন সুরক্ষিত। কাহার সাধ্য তাহাদের কিছু বলে!

৩

কিন্তু এমন করিয়া তো দিন চলে না, কিছু করা দরকার। দুজনে দুদিকে গেলে একটা ব্যবস্থা হইতে পারে কিন্তু দু'জনের বিচ্ছেদ অচিন্ত্যনীয়। আবার দুজনে একদিকে গেলেও ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব কিন্তু বিপদের আশঙ্কা বর্ত্তমান। অথচ এখানে এই মাঠের মধ্যে বসিয়া থাকিলে জীবিকার্জ্জনে কি উপায়

হইবে? কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদ হইতেই আবিষ্কারের উদ্ভব। এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা ঘটিল না।

ইয়াসিন ও গোপাল লক্ষ্য করিল যে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সংখ্যালঘুরা লুঙ্গি ও ফেজ পরিয়া আসে আবার পশ্চিমাঞ্চল হইতে সংখ্যালঘুরা ধুতি ও খদ্দরের টুপি পরিয়া আসে। আর এখানে আসিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া লুঙ্গির বদলে ধুতি পরিয়া, ধুতির বদলে লুঙ্গি পরিয়া, ফেজের বদলে টুপি পরিয়া, টুপির বদলে ফেজ পরিয়া—সীমানা চিহ্ন অতিক্রম করিয়া ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশিয়া যায়।

তাহারা আরও লক্ষ্য করিল যে যথা সময়ে যথা সংখ্যক টুপি, ফেজ, ধুতি ও লুঙ্গি পাইতে সংখ্যালঘুগণের বড়ই অসুবিধা হয়। অধিকাংশ সময়েই চোরাবাজারি মূল্য দিয়া তাহাদের ওসব বস্তু কিনিতে হয়। তখন ইয়াসিন ও গোপাল ভাবিল এই ব্যবসাই করা যাক না কেন, লোকও ন্যায্য মূল্যে বাঞ্ছিত পোষাক পাইবে, আমাদেরও জীবিকার অন্য আর দূরে যাইবার আবশ্যক হইবে না।

যে চিন্তা সেই কাজ!

গোপাল প্রচুর খদ্দরের টুপি ও ধুতি আমদানি করিল; ইয়াসিন আমদানি করিল প্রচুর ফেজ ও লুঙ্গি। আর লম্বা একখানা তক্তার উপরে এই সম্মিলিত ব্যবসায়ের নাম "ইয়াসিন শর্ম্মা এণ্ড কোং" বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া সীমানা চিহ্নের উপরে আড়াআড়ি টাঙাইয়া দিল। "ইয়াসিন" শব্দটা পড়িল সীমানার পূবে, 'শর্ম্মা' শব্দটা পড়িল সীমানার পশ্চিমে—কাজেই আন্সার বা জনতার কাহারো কিছু বলিবার রহিল না, বরঞ্চ একরূপ ন্যায়পরতা দেখিয়া উভয় পক্ষই যেন সন্তুষ্ট হইল।

পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সংখ্যালঘু আসে, গোপাল তাহাকে ন্যায্যমূল্যে ধুতি ও টুপি বিক্রয় করে, সে আত্মসংশোধন করিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া যায়। পরিত্যক্ত লুঙ্গি ও ফেজ ইয়াসিন নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া লয়। আবার

পশ্চিমাঞ্চল হইতে সংখ্যালঘু আসে, ইয়াসিন তাহার কাছে ন্যায্যমূল্যে ফেজ ও লুঙ্গি বিক্রয় করে, সে আত্মসংশোধন করিয়া পূব দিকে চলিয়া যায়; গোপাল তাহার পরিত্যক্ত ধুতি ও টুপি নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া লয়। এইভাবে পৃথক না হইয়াও, দুজনের জীবন, ব্যবসা ও বন্ধুত্ব বেশ চলিতে লাগিল।

অল্পদিনের মধ্যে "ইয়াসিন শর্ম্মা এণ্ড কোং" এমন বিখ্যাত হইয়া উঠিল যে দেশ বিদেশের সংবাদপত্রে উক্ত দোকানের ছবি ছাপা হইয়া গেল। ইউ. এন. হইতে বিশেষ প্রতিনিধি আসিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে এমন একটা গুজবও ক্রমে সংবাদপত্র যোগে ছড়াইয়া পড়িল।

সংখ্যালঘুগণের আগম নির্গম নিয়মিত চলে—তবে মাঝে মাঝে উজান ভাটির স্রোত প্রবলতর হইয়া ওঠে, তখন "ইয়াসিন শর্ম্মা এণ্ড কোং"র ব্যস্ততার অন্ত থাকে না। আবার স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিলে ইয়াসিন ও গোপাল দুদণ্ড গল্প করিবার ও কল্কে বিনিময় করিবার অবকাশ পায়।

গোপাল বলে—ভাই

ইয়াসিন বলে—দোস্ত

গোপাল বলে—হরি

ইয়াসিন বলে—আল্লা

আর দুই পক্ষের জনতা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া করে হল্লা।

৪

কয়েকদিন হইল আগম নির্গমের স্রোত অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইয়াসিন শর্ম্মা এণ্ড কোং"র না আছে বিরাম, না আছে আহার, না আছে নিদ্রা। নিদ্রার ব্যাঘাতই কিছু বেশি, কারণ স্রোতটা রাতের বেলাতেই প্রবলতর।

সারারাত্রি প্রয়োজনীয় পোষাক সাপ্লাই করিয়া গোপাল ও ইয়াসিন

কেবল বসিয়াছে—তখনো প্রথম কল্কি বিনিময় হয় নাই এমন সময়ে তাহারা দেখিতে পাইল যে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে একজন সংখ্যালঘু প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে, আর তার পিছনে একদল লোক তাড়া করিয়া আসিতেছে। গোপাল ও ইয়াসিন সশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল, এমন সময় কথিত সংখ্যালঘু ছুটিয়া আসিয়া সীমানা চিহ্নের উপর আড়াআড়ি পড়িয়া গেল, তাহার দেহের উপরার্দ্ধ পড়িল পশ্চিমে, নিম্নার্দ্ধ রহিল পূর্ব্বদিকে। একদিকে পড়িল তাহার ফেজ পরিহিত মাথা, আর একদিকে থাকিল তাহার লুঙ্গি পরিহিত দেহার্দ্ধ। ফলে দুই দিকেরই জনতা লাঠি উঁচাইয়া অবিবেচক সংখ্যালঘুর প্রতি ধাবমান হইল। গোপাল এক লাফে অগ্রসর হইয়া তাহার মাথা হইতে ফেজ খুলিয়া লইয়া একটি খদ্দরের টুপি পরাইয়া দিল, পশ্চিমদিকের জনতা বাঞ্ছিত সংশোধন দেখিয়া শান্ত হইল। কিন্তু পূর্ব্বদিকের জনতা তখনও ক্ষুব্ধ।

ইয়াসিন বলিল—তোমরা রাগো কেন? লোকটা তো ধুতি পরিয়া নাই; ধুতি হইলে রাগিতে পারিতে।

পূবের জনতা বলিল—এতো 'লেহ্ন' বাত হ্যায়; পশ্চিমের জনতা তাহার মাথায় ফেজের বদলে, খদ্দরের টুপি দেখিয়া বলিল—মাইরি, স্লা—যখন খদ্দর পরেছে আর মারিস নে! কিন্তু মামলা যাহার জন্য সেই লোকটা ওঠে না কেন? মরিল না অজ্ঞান হইল!

অজ্ঞানই বটে?

লোকটাকে তুলিয়া লইয়া সেবা শুশ্রূষা করা আবশ্যক। কিন্তু ঐখানেই গোল বাধিল। ওখানে ঐভাবে শুইয়া থাকিলে তো সেবা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সরাইবার উপায় নাই। পশ্চিমে লইবার চেষ্টা হইলে পূবের লোকে আপত্তি করে, বলে, ইচ্ছা করিয়া যাইত, সে একপ্রকার। জোর করিয়া লইলে আমরা লাঠি ধরিতে বাধ্য হইব।

আবার পূবে লইবার চেষ্টা করিলে পশ্চিমের জনতা বলে—সাবধান,

ওকে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিলে দিল্লী-চুক্তির মুণ্ডপাত হইবে, আমরা এখনি প্রধান মন্ত্রীকে তার করিব।

ফলে লোকটাকে সেবা করা সম্ভব হয় না। ইয়াসিন পূবদিকের প্রতি বলে, আপনারা একটু সমঝিয়া দেখুন।

গোপাল পশ্চিমদিকের প্রতি বলে, আপনারা একটু বিচার করিয়া দেখুন।

গোপাল ও ইয়াসিন সমস্বরে বলে—লোকটা মরিবে নাকি?

পূব ও পশ্চিম তদুত্তরে সমস্বরে বলে—তাই বলিয়া তো অবিচার করা সম্ভব নয়; তাহা হইলে রাজ্য যে রসাতলে যাইবে!

লোকটা পড়িয়াই থাকে। তাহাকে সরানো যায় না। সামান্য একটা মানুষের প্রাণহানি হইবে বলিয়া তো নিয়ম ভঙ্গ করা সম্ভব হয় না।

# সিদ্ধান্ত

মানস সরোবরের তীরে দেবতাদের কার্য্যকরী সমিতি বসিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ব্রহ্মা সরোবরের জলে একটি প্রমাণ-সই পদ্মের উপরে আসীন; পদ্মের ডাঁটাটি শক্ত নয়, অর্থাৎ ব্রহ্মার ওজনের তুলনায় ক্ষীণ; ব্রহ্মার ভারে পদ্মটি নড়চড় করিতেছে, ব্রহ্মা টাল সামলাইতে ব্যস্ত। অদূরে আপন বৃষভটিকে ঠেস দিয়া মহাদেব বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছেন। বিষ্ণু এখনো আসিয়া উপস্থিত হন নাই, তিনি আসিলেই সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

ব্রহ্মা বলিলেন—বিষ্ণুভায়ার এখনো দেখা নাই।

তাঁহার কথার উত্তরে ঘুমে মহাদেবের ঘাড়টা কয়েকবার নড়িয়া উঠিল।

ব্রহ্মা বলিলেন—ওকি, কাল রাত্রে বুঝি ভালো ঘুম হয় নাই?

মহাদেবের নাকটা সশব্দে আপত্তি করিয়া উঠিল।

ব্রহ্মা আপন মনেই বলিলেন—নাঃ, এ বুড়াকে লইয়া পারা গেল না, রাত্রে জাগিয়া থাকিয়া দিনে ঘুমাইবে। অথচ আজকার আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত জরুরি।

এমন সময়ে বিষ্ণু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নব্য বাবুরা রিঙে বদ্ধ চাবির গুচ্ছ যেমন আঙুলে ঘোরায় তিনি তেমনিভাবে সুদর্শন চক্রটিকে ঘুরাইতেছেন।

ব্রহ্মা ॥ এসো ভায়া, দেরি যে ?

বিষ্ণু ॥ অনেকটা পথ।

ব্রহ্মা ॥ আচ্ছা ব'সো।

বিষ্ণু ॥ উনি যে নিদ্রিত ?

ব্রহ্মা ॥ কবে বা জাগ্রত ?

বিষ্ণু ॥ আজ অসময়ে অধিবেশন কেন ?

ব্রহ্মা ॥ কার্য্যসূচী খুব জরুরি।

বিষ্ণু ॥ বিষয়টা কি ?

ব্রহ্মা ॥ পৃথিবীর খবর কিছু রাখো ?

বিষ্ণু ॥ না, অনেক দিন ওদিকে মন দিতে পারিনি। কেন, কি হয়েছে ?

ব্রহ্মা ॥ ব্যাপার গুরুতর।

বিষ্ণু ॥ বিস্তারিত বলো।

ব্রহ্মা ॥ মানুষের বুদ্ধির স্পর্দ্ধা অসহ্যপ্রায় হ'য়ে উঠেছে।

বিষ্ণু ॥ বুদ্ধি থাকলেই স্পর্দ্ধা স্বাভাবিক, স্বর্গ সম্বন্ধে সে অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

যুগপৎ মহাদেবের নাসিকা ও বৃষভ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বিষ্ণু ॥ ওটা সমর্থন না প্রতিবাদ ?

ব্রহ্মা ॥ আওয়াজ একটা হ'লে বলা সহজ ছিল।

বিষ্ণু ॥ এখন পৃথিবীর খবর বলো।

ব্রহ্মা ॥ বিশ্বের আদিম রহস্যের কাছাকাছি মানুষে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বিষ্ণু ॥ বলে যাও—

ব্রহ্মা ॥ তোমার মনে আছে কিনা জানিনা, মানুষকে সৃষ্টি ক'রে আমরা ব'লে দিয়েছিলাম যে তোমাকে বস্তু দেওয়া হ'ল, আর দেওয়া হ'ল শক্তি—এই দিয়ে কাজ চালিয়ে নাও, সর্ব্বশক্তিমান্ হ'তে পারবে। মনে আছে ?

বিষ্ণু ॥ বিলক্ষণ।

ব্রহ্মা ॥ মানুষ বিজ্ঞান-চর্চা করতো, তাতে আমরা খুশীই হ'তাম। কিন্তু সম্প্রতি ঐ পথে চল্‌তে চল্‌তে সে এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হ'য়েছে যাতে বস্তুকে শক্তিতে পরিণত করতে সমর্থ হ'য়েছে।

বিষ্ণু ॥ তাতে ক্ষতি কি ?

ব্রহ্মা ॥ আর একবার কি স্বর্গ থেকে তাড়িত হ'তে চাও নাকি ?

বিষ্ণু ॥ কেন ?

ব্রহ্মা ॥ কেন কি ? বস্তু অর্থাৎ জড়, আর শক্তি অর্থাৎ চৈতন্য—এই ভেদজ্ঞান দূর হলেই তো দৈবত্বপ্রাপ্তি ঘটে। এখন মানুষ দেবতা হ'লে কি আর আমাদের স্বর্গে থাকৃতে দেবে ?

বিষ্ণু ॥ আমরা না হয় পৃথিবীতেই যাবো। জায়গাটা মন্দ নয় হে। সেবার বৃন্দাবনে গিয়ে নাম পালটে কিছুদিন ছিলাম কিনা।

ব্রহ্মা ॥ এখন ঠাট্টা রাখো। যে mandate দিয়ে মানুষকে পাঠানো হয়েছিল ওরা তা ভঙ্গ করেছে। এর প্রতিকার আবশ্যক।

সদ্য নিদ্রোত্থিত মহাদেব বলিয়া উঠিলেন, আমার আরও খানিকটা সিদ্ধি আবশ্যক।

ব্রহ্মা ॥ তা পাবে। এখন কাজে মন দাও দেখি।

মহাদেব ॥ সিদ্ধিলাভ ছাড়া আর কি কাজ ?

ব্রহ্মা তাহাকে সব বুঝাইয়া বলিলেন। মহাদেব কিছুই বুঝিতে চান না বটে, কিন্তু মন দিয়া শুনিলে সব চট করিয়া বুঝিতে পারেন। মাথা খুব পরিষ্কার। বর্ত্তমান পরীক্ষার বাজারে কড়াকড়ির দিনেও একবারেই পাশ করিতে পারিতেন তিনি।

মহাদেব ॥ অবিলম্বে ব্যবস্থা আবশ্যক।

বিষ্ণুব ওরই মধ্যে একটু 'প্রোগ্রেসিভ আউটলুক'। তিনি বলিলেন, মানুষের দোষটা কি ?

ব্রহ্মা ॥ প্রথম দোষ, যে সর্ত্তে তাদের মর্ত্ত্যের অধিকার দিয়েছিলাম, সেই সর্ত্ত ভঙ্গ করেছে। দ্বিতীয় দোষ, বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করবার ফলে যে-অস্ত্র তারা আবিষ্কার করেছে তার প্রতাপে কেবল মানুষ নয়, চরাচর জ্বলে যাবে। তৃতীয় দোষ, ওরা ঐ অস্ত্রের বলে অমিতশক্তি হ'যে স্বর্গ উদ্ধার ক'রে নিতে পারে।

মহাদেব ॥ নিতে পারে কি ? এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিয়েছে। ওরে, আমার গিন্নির না জানি কি হ'ল—বলিয়া তিনি ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ব্রহ্মা ॥ এ বুড়োকে নিয়ে ভারি গোল বাঁধলো দেখছি।

বিষ্ণু ॥ এখন কি করতে চাও ?

ব্রহ্মা ॥ বাইরে থেকে কিছু করতে গেলে ওরা ক্ষেপে উঠ্‌বে—বলবে 'ডিক্‌টেটারশিপ' চালাচ্ছে। তার চেয়ে নিজের অস্ত্রেই ওরা মরুক, ছেলেরা যেমন নিজের ছুরিতে হাত কেটে ফেলে।

বিষ্ণু ॥ তবে তাই হোক।

ব্রহ্মা ॥ সৃষ্টিব আদি রহস্যের নামই স্বর্গ। মানুষে বুঝুক যে তার কাছে এসে পড়া বিপজ্জনক !

বিষ্ণু ॥ ওরা ধ্বংস হ'য়ে গেলে—তারপর ?

ব্রহ্মা ॥ আবার নূতন সৃষ্টি করা যাবে।

বিষ্ণু ॥ তারপর ?

ব্রহ্মা ॥ তারা আবার যদি আদি রহস্যের কাছে এসে পড়ে, ধ্বংস হবে।

বিষ্ণু ॥ এমনিই কি বরাবর চলবে ?

ব্রহ্মা ॥ বরাবর—কেন না, সৃষ্টি আর ধ্বংস চ [illegible] মিলেই তো চরাচরের পূর্ণ মূর্ত্তি।

বিষ্ণু ॥ তবে তাই হোক।

ব্রহ্মা ॥ নাও, সই করো। এই বলিয়া সিদ্ধান্তের কাগজখানা দিলেন।

বিষ্ণু স্বাক্ষর করিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের হাতে কলম গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—সই করো।

মহাদেব চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—সই? কার সই? জয়া বিজয়া দুর্গার সই।

ব্রহ্মা ॥ আ মলো যা! সই মানে স্বাক্ষর।

মহাদেব ॥ তাই বলো। কিন্তু সই করলে কি গিন্নিকে পাবো?

ব্রহ্মা ॥ নিশ্চয়।

মহাদেব ॥ সিদ্ধি?

ব্রহ্মা ॥ দুটো?

মহাদেব ॥ তবে শেষেরটাই দিও।

ব্রহ্মা ॥ তাই হবে।

তখন মহাদেব হৃষ্ট চিত্তে স্বাক্ষর করিলেন এবং পর মুহূর্ত্তেই ষাঁড়ের গায়ে ঠেস দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

# পুকুর চুরি

হঠাৎ একটা নাড়া খাইয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখি কেমন একটা ব্যস্ততার ভাব। পাইলট, বেতার অফিসার ও অন্যান্য সকলেরই মুখে কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া। রাত্রি বেলায়, দু'হাজার ফুট উঁচুতে, এরোপ্লেনের মধ্যে এমন পরিস্থিতি নিশ্চয়ই উপভোগ্য নয়। শুধাইলাম, ব্যাপার কি? কেহ উত্তর দিল না। এরোপ্লেনখানিতে যাত্রী আমি একাই, বাকি সকলেই অফিসার বা ঐ শ্রেণীর লোক।

একবার মনে হইল এরোপ্লেনখানা একই জায়গায় চক্রাকারে ঘুরিতেছে —ওটা মাটিতে নামিবার ভূমিকা। কিন্তু নামিবে কোথায়? এটা কোন্ জায়গা? কিছুই বুঝিতে পারি না, কেহ উত্তরটুকুও দেয় না। কিছুক্ষণ পরে একজন অফিসার আসিয়া সীটের সঙ্গে আমাকে বেল্ট দিয়া বেশ শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিয়া গেল, বলিল, ফোর্স্ড ল্যাণ্ডিং করিতে হইবে।

হঠাৎ সে কেন যে আমার উপরে সদয় হইয়া উঠিল জানি না, অনেক কথা বলিল, বোধ করি নিজের মনে ভয় হইয়াছিল তাহা আমার ঘাড়ে চাপাইয়া আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেকেই সান্ত্বনা দিয়া গেল। সে বলিল, আমরা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি, তেলও ফুরাইবার মতো, কাজেই এখনই নামিতে হইবে।

—অন্ধকার যে।

—তা হোক, চাঁদের আলো আছে।

—এ কোন্ দেশ?

—জানি না, বেতারের ইসারা পাওয়া যাচ্ছে না।

—তবে উপায়?

—ফোর্সড ল্যাণ্ডিং আপনি বেল্ট এঁটে শক্ত হ'য়ে বসুন।

তারপর উপদেশের উপরি পাওনা স্বরূপ বলিল—কোন ভয় নেই।

মনে মনে বলিলাম—ভরসাই বা কি?

এরোপ্লেন ফোর্সড ল্যাণ্ডিং করিয়াছে, কেহ জখম হয় নাই, বিমানখানাও আস্ত আছে, আমরা সকলেই বাহির হইয়াছি—কিন্তু এ কোন্ দেশ?

একটা শুকনো নদীর দীর্ঘ বালুচরে নামিয়াছি। তীরে উঠিয়া দেখিলাম অদূরে পাহাড় ও বন, লোকালয়ের কোন চিহ্ন নাই। তবে এখন রাত্রি, জনপদ থাকিলে ভোরের আলোয় দেখা যাইবে। তাই সকলে ভোরের আলোর ভরসায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। উদ্বেগে ও পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন ছিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম—সেখানে সেই মাটীর উপরেই। কঠিন ক্লান্ত দেহের পুষ্পশয্যা!

## ২

ঘুম ভাঙ্গিতেই চারিদিকের দৃশ্য চোখে পড়িল। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের বেষ্টনী, ওপারে কি আছে দেখা যায় না। কিন্তু না দেখিলেও চলে না, কারণ বারো ঘণ্টার মধ্যে কাহারো আহার হয় নাই। বিমানের অফিসারগণ বিমান ছাড়িয়া যাইতে রাজি নয়, কোন রকমে বিমানখানা নষ্ট হইলে ফিরিবার পথ বন্ধ হইবে। অগত্যা আমাকেই খাদ্যের সন্ধানে যাত্রা করিতে হইল।

প্রায় দুই ঘণ্টা চলিবার পরে পাহাড়ের বেষ্টনী অতিক্রম করিলাম, নীচু পাহাড়, কষ্ট হইল না। পাহাড় পার হইবামাত্র অদূরে একটি জনপদ

চোখে পড়িল। আমি উৎফুল্ল হইয়া সেই দিকে চলিলাম এবং অল্পক্ষণ পরেই একটি ছোট সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানকার বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনার আগে কাজের কথা সারিয়া লই।

কিছু খাদ্য কিনিয়া নিজে খাইলাম এবং বিমান নাবিকদের জন্য খাদ্য লইয়া ফিরিয়া গেলাম। আহারান্তে তাহারা বিমানের বিকল কল-কব্জা মেরামতে আত্মনিয়োগ করিল। আমি আবার সহরে ফিরিয়া আসিলাম। বিমানখানা মেরামত করিতে তিন দিন সময় লাগিয়াছিল—এই তিন দিনের অধিকাংশ সময়ই আমি সহরটিতে ছিলাম, নানা স্থানে ঘুরিয়া, নানা লোকের কথাবার্ত্তা বলিয়া সেখানকার অবস্থা জানিয়া লইতে চেষ্টা করিতাম। যাহা জানিলাম—একেবারে বিচিত্র। সে কথা পরে বলিতেছি। তিনদিন পরে বিমান মেরামত হইলে আমরা বিমান যোগে আমাদের গন্তব্যস্থানে নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিলাম। এবারে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কিয়দংশ বর্ণনা করিতেছি। সুযোগ হইলে পরে আরও লিখিব।

শহরটির নাম হবুনগর। হবুচন্দ্র রায় সেখানকার রাজা। একদিন রাত্রে বাসস্থানে ফিরিবার পথে দেখিতে পাইলাম প্রকাণ্ড একটি পুকুরের এক কোণে বসিয়া একটি লোক একটা গর্ত্ত খুঁড়িতেছে। পুকুরটির অপর কোণে পৌঁছিতেই দেখিলাম আর একটি লোক অনুরূপ একটি গর্ত্ত খুঁড়িতেছে। ক্রমে দেখিতে পাইলাম যে পুকুরের চার কোণে চারিটি লোক ঠিক একই রূপ গর্ত্ত খুঁড়িতেছে। তখন বড়ই কৌতূহল হইল, ব্যাপার কি? ইহারা করিতেছে কি? আমি তাহাদের একজনকে শুধাইলাম—হাঁ, মহাশয়, আপনারা কি করিতেছেন? সেই লোকটি বলিল—আমরা যাহা খুশী করি না কেন—আপনার কি? আপনি আপনার কাজে যান।

বুঝিলাম যে আমার কৌতূহল প্রকাশ সত্যই অন্যায় হইয়া গিয়াছে—অতএব কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া আমি বাসস্থানের অভিমুখে চলিয়া আসিলাম।

পরদিন সকালে আবার হবুনগরে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম যে সহরে বড় চাঞ্চল্য। একজনকে শুধাইলাম, মহাশয়, আপনারা এমন ব্যস্ত হইয়াছেন কেন?

সে বলিল—জানেন না বুঝি কাল রাত্রে একটা পুকুর চুরি হইয়া গিয়াছে।

—পুকুর চুরি! এমন তো শুনি নাই।

সে বলিল—ক্রমে আরও শুনিবেন, আপনি নিশ্চয় এ রাজ্যের লোক নন।

তখন সেই লোকটির সঙ্গে অকুস্থান অভিমুখে চলিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পরে গত রাত্রের সেই পুকুরের নিকটে পৌঁছিলাম।

কিন্তু এ কি? পুকুর কোথায়? একটি গর্ত্ত মাত্র পড়িয়া আছে। আর আছে চার কোণে চারটি গর্ত্তের চিহ্ন।

লোকটি বলিল—মহাশয়, কাল রাত্রে কয়েকজনে মিলিয়া সিঁধ কাটিয়া পুকুরটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, পুকুরের সঙ্গে জল ও মাছ—দুই-ই গিয়াছে!

প্রথমে বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিলে বলিলাম যে পুকুর চুরির কথা প্রবাদে শুনিয়াছিলাম এবারে—

—চোখে দেখিলেন তো!

এবারে মনে হইল রাত্রে লোকগুলি যে গর্ত্ত খুঁড়িতেছিল তাহা আর কিছুই নয়, চুরি করিবার ভূমিকা। কিন্তু আমি কোন কথা প্রকাশ করিলাম না পাছে আমাকে চোরদের অন্যতম বলিয়া গ্রেপ্তার করে। বিশেষ আমি বিদেশী লোক, কেহ আমাকে রক্ষা করিতে আসিবে না।

হাতী চুরি অবধি শুনিয়াছিলাম, একবার একটা হাতী চোরকে আদালতে দেখিয়াও ছিলাম! কিন্তু পুকুর চুরিও যে বাস্তব ঘটনা হইতে পারে—তাহা সত্যই অজ্ঞাত ছিল—হবুনগরে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম!

দেশে ফিরিয়া ঘটনাটি অনেকের কাছে বলিয়াছি—কিন্তু কেহ একটা বড় বিশ্বাস করে নাই। বিশ্বাস করে নাই ভালই—তাই দেশের পুকুরগুলি এখনো যথাস্থানে আছে!

# নর-পশু সংবাদ

শনিবার সন্ধ্যা। বাবুরা স্থির করিলেন যে আগামী কাল একটু আমোদ আহ্লাদ করিতে হইবে, আহারাদির একটু বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। তখন সকলে সিদ্ধান্ত করিল যে একটি পাঁঠা মারিয়া মাংস ও তৎসহ পোলাও দ্বারা ভোজ সমাধা করিবে। মানুষের আমোদ আহ্লাদের মধ্যে জীবহত্যার স্থান অপরিহার্য। রমেশের উপরে ছাগ হত্যার ভার পড়িল, সে বরাবর ঐ কাজটি করিয়া থাকে। ভালই করে, তাহার বাড়ীতে যে রামদাখানা আছে তাহা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি ওজন-সই।

রমেশ সোৎসাহে বলিল—আমি কাল খুব ভোরেই পাঁঠা মেরে তৈরী ক'রে রাখবো—তারপরে তোমরা ধীরে সুস্থে যেয়ো। আমি এখন যাচ্ছি, পাঁঠা কিনবার জন্য।

এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল। বাকি সকলে আসন্ন সুখাদ্য স্মরণ করিয়া গল্প গুজব করিতে লাগিল, কিন্তু আর তেমন জমিয়া উঠিল না, যেহেতু সেই সুখকর অভিজ্ঞতার আগাম স্বাদ সমস্ত কেমন ফিকা করিয়া দিল। তাহারা উঠিয়া পড়িল।

২

রবিবার অতি প্রত্যুষে অর্থাৎ পবিত্র ব্রাহ্ম মুহূর্তে রমেশ একটি সবল ছাগকে

টানিতে টানিতে বাড়ির বাহিরে লইয়া গিয়া তাহাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব কথিত প্রসিদ্ধ রামদাখানা উত্তোলন করিল, তখন সেই হনুমান ছাগ রমেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—আমাকে মারিতেছ কেন ?

ছাগের কথা বলায় রমেশের বিস্ময় বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু তেইশ বৎসর ব্যবসা করিবার পরে রমেশ এখন আর কিছুতেই বিস্মিত হয় না।

সে বলিল—মারিব না কেন ?

ছাগ বলিল--তোমার হাতে যখন রামদা, আর আমি যখন দুর্বল, অবশ্যই মারিবে, কিন্তু তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিবে কি ? রমেশ বলিল, ছাগলের প্রশ্নের জবাব দিয়াই সারা জীবন কাটিল, আচ্ছা, বেশ, তাড়াতাড়ি সারিয়া লও, ভোজে দেরী হইলে চলিবে না।

তখন রমেশ ও সেই ছাগলের মধ্যে যে প্রশ্নোত্তর চলিল—তাহাই আমার গল্প। সে বিচিত্র কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি। রমেশকে অতঃপর মানুষ বলিয়া উল্লেখ করিব আশা করি তাহাতে কেহ বিস্মিত হইবেন না।

ছাগ। তুমি দাস হইয়া আমাকে মারিতে উদ্যত কেন ?

মানুষ। আমি দাস হইলে তুমি তবে প্রভু ?

ছাগ। ধরিয়াছ ঠিক। তবে তুমি বলিতে এখানে রমেশবাবু নয় মানুষ মাত্রকেই বুঝিতেছি।

মানুষ। কি যে বলো। মানুষ দাস পশু প্রভু ?

ছাগ। তাই বটে।

মানুষ। কেন শুনিতে পাই ?

ছাগ। দাসের কার্য সেবা। মানুষে পশুর যেরূপ সেবা করে, এমন সেবা কোন দাস কোন প্রভুর করিয়া থাকে ?

মানুষ। কিরূপ ?

ছাগ। প্রথমে আমার সম্প্রদায়ের কথাই ধরো। ছাগ পালনের জন্য মানুষ কি পরিশ্রম, কি খরচই না করিয়া থাকে ? তারপরে হাঁস, মুরগী

প্রভৃতি পক্ষী পালনের খরচের ও পরিশ্রমের বহরটা স্মরণ করিয়া দেখো। শুনিয়াছি পক্ষী পালন শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় আছে, পত্রিকা আছে, সত্য কিনা তুমি বলিতে পারো।

মানুষ। আছে বলিয়া শুনিয়াছি।

ছাগ। মানব শিশু পালনের জন্য কি বিদ্যালয় আছে?

মানুষ। থাকিতে পারে, শুনি নাই।

ছাগ। তোমরা যাহাকে চিড়িয়াখানা বলো, একবার সেখানে বেড়াইতে গিয়া মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম।

মানুষ। কেন?

ছাগ। আর একটু হইলেই ধরিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিত।

মানুষ। ভয়টা কিসের?

ছাগ। অত সুখ সহিবে না।

মানুষ। সুখ দেখিলে কোথায়?

ছাগ। সুখ নয়? সেখানে পশুগুলা যেরূপ যত্নে লালিতপালিত ও রক্ষিত হয়—এমন আর কোথায়? কোন পশুমাতার সাধ্যও নাই যে পশুকে এমন আদরে রক্ষা করে!

মানুষ। তবে পলাইতে গেলে কেন?

ছাগ। ঐ তো বলিলাম, অত সুখ সহিবে না।

মানুষ। তুমি কি যে সুখ দেখিলে?

ছাগ। সুখ দুঃখ সবই তুলনামূলক। দেখিলাম যে খাঁচার মধ্যে একটা সিংহ বসিয়া আরামে সমাংস হাড় চিবাইতেছে আর খাঁচার বাহিরে একটা শীর্ণ ভিক্ষুক বাবুদের কাছে একটা পয়সা মাগিয়া ফিরিতেছে। সুখ নয়? আর বাবুরা ভিক্ষুকটাকে 'খাটিয়া খাও' বলিয়া তাড়াইয়া দিয়া সিংহের উদ্দেশ্যে মাংসখণ্ড ছুড়িয়া দিতেছে! সুখী কে? সেই ভিক্ষুকটা না সিংহটা—তবে?

মানুষ। তুমি কিছুই বোঝো না, পশুদের আরামে রাখিবার উদ্দেশ্যে চিড়িয়াখানার সৃষ্টি নয়, শিক্ষার জন্যই চিড়িয়াখানার সৃষ্টি মানুষ করিয়াছে।

ছাগ। তবেই দেখো, পশুর কাছে তোমাদের অনেক শিখিবার আছে। কোন পশু তো মানুষের কাছে শিখিবার আশায় চিড়িয়াখানা তৈয়ারী করে না।

মানুষ। তোমরা যে পশু।

ছাগ। তা নয়, তোমরা যে মানুষ, তোমাদের কাছে আমাদের শিক্ষণীয় কিছুই নাই।

মানুষ। আমাদেরই বা কি আছে?

ছাগ। নাই? তবে তোমাদের মনুষ্য-কবি কি মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন? শোনো—

"I think I could turn and live with animals,
they are so placid and selfcontained,
They do not sweat and whine about their condition,
Not one kneels to another, nor to his kind that lived
thousands of years ago,
Not one is respectable or unhappy over the whole earth!"

কি, অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে নাকি? তোমাদের সব মানুষ আবার ইংরাজি সমান বুঝিতে পারে না।

মানুষ। না, তার প্রয়োজন নাই। তবে আমার ধারণা···ওটা তোমার বানানো।

ছাগ। এবারে হাসাইলে। যদি স্বীকার করো যে এমন সুন্দর ইংরাজি আমি বানাইতে পারি, তবে তোমাদের গ্র্যাজুয়েটের কি অবস্থা হইবে?

মানুষ। স্বীকার করিলাম ওটা তুমি বানাও নাই, কিন্তু তাই বলিয়াই কথাগুলা সত্য এমন বলি না।

ছাগ। মুখে নাই বলিলে, মনে মনে অবশ্যই স্বীকার করো।

মানুষ। কেমন?

ছাগ। মানুষে পশুকে আদর্শ মনে করে।

মানুষ। সে আবার কি?

ছাগ। ব্রিটিশ নিজেকে সিংহ মনে করে কেন? রুশ নিজেকে ভল্লুক মনে করে কেন? জার্মান নিজেকে ঈগল মনে করে কেন? উত্তর ভারতের লোক পুত্রের নাম হনুমান প্রসাদ রাখিয়া গর্ব বোধ করে কেন?

মানুষ। আমরা বাঙালারা হনুমানকে ঠাট্টার পাত্র মনে করি।

ছাগ। তোমরা নিজের শ্যালককেও ঠাট্টার পাত্র মনে করো, শিক্ষককে উপহাসের পাত্র মনে করো, টাকা ধার লইয়া ফেরৎ চাহিলে পরিহাস বলিয়া মনে করো—তোমাদের কথা স্বতন্ত্র, আমি মানুষের কথা বলিতেছি।

মানুষ। তুমি এত কুতর্ক শিখিলে কোথায়?

ছাগ। বাংলা দেশে আমার জন্ম আর এখানেই—

মানুষ। মরিবে।

ছাগ। "এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।"

মানুষ। তোমার অনেক কবিতা মুখস্থ যে!

ছাগ। হইবে না, আমি যে বাঙ্গালী ছাগ!

মানুষ। দেখো সাবধান, বাঙ্গালী ছাগ নয়। বাঙ্গালী কবি কি বলিয়াছেন জানো তো? "মানুষ আমরা, নহি তো মেষ"।

ছাগ। নিশ্চয়ই নও, হইলে আমরাই প্রথমে আপত্তি করিতাম।

মানুষ। তবে তো স্বীকার করিলে যে আমরা ছাগ নই?

ছাগ। কেন না করিব? ঐ কথাটাই তো এতক্ষণ বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, বলিতেছি যে তোমরা ছাগদাস বা পশুদাস।

মানুষ। অসহ্য!

ছাগ। আর ঐ খড়্গের আঘাত খুব সুসহ! তাই না?

মানুষ। হায়, সমস্ত মানুষ কেন আমিষাহারী হইল না।

ছাগ। কেন?

মানুষ। তবে এতদিনে তোমার মতো দাম্ভিক পশুকুল নিশ্চিহ্ন হইত। বাঁচা যাইত!

ছাগ। পশুর অভাবে তখন তোমরা পরস্পরকে খাইতে কি বলো?

মানুষ। দাঁড়াও, শীঘ্রই তোমাদের নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিব।

ছাগ। তাহার বিপরীত সম্ভাবনাটাই প্রবল।

মানুষ। তোমরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করিবে?

ছাগ। না, তাহার প্রয়োজন হইবে না, তোমরা নিজেরাই নিজেদের নিশ্চিহ্ন করিতে পারিবে, যে সব অস্ত্রপাতি আবিষ্কার করিতেছ।

মানুষ। তখন?

ছাগ। তখন মানবহীন ভূপৃষ্ঠে অন্যান্য জীব সুখে বসবাস করিতে পারিবে, অর্থাৎ আমরা কেবল তোমাদের প্রভু নই, উত্তরাধিকারীও বটে।

মানুষ: ইস্‌, কি আস্পর্ধা! দেখ ব্যাটা পাঁঠা, তোরা আর কোন গুণে শ্রেষ্ঠ না হইলেও তোদের মাংস যে নরমাংস অপেক্ষা অনেক বেশী সুস্বাদু তাহাই আজ প্রমাণ করিব।

এই বলিয়া রমেশ উদ্যত খড়্গ লইয়া পাঁঠাটির প্রতি ধাবমান হইল, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছিবার আগেই হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেল—তাহার হাতের রামদা ছিটকাইয়া দূরে পড়িল।

তখন পাঁঠা উক্ত দাখানি দ্রুত তুলিয়া লইয়া বলিল—আজ আমি প্রমাণ করিব যে নরমাংস অত্যন্ত সুস্বাদু, কোথায় লাগে ছাগমাংস, অন্ততঃ ঐ একটা বিষয়ে পাঁঠার উপরে মানুষের জিত।

এই বলিয়া রমেশ উঠিবার আগেই এক কোপে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিল।

অতঃপর সে রমেশের কাপড় চোপড পরিয়া ভূতপূর্ব্ব রমেশের মাংস যথারীতি কাটিয়া কুটিয়া গরম মশলা সহযোগে পাক করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল।

যথাসময়ে রমেশের বন্ধুরা আসিয়া আহারে বসিল। সকলেই স্বীকার করিল, যেমন মাংস তেমনি পাকের কৌশল। সকলেই বলিল, রমেশ, তোমার বাহাদুরি আছে বটে!

আর ভূতপূর্ব ছাগ রমেশের পোষাক পরিয়া মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল —যা বলেছ ভাই।

কেহই ছাগকে ছাগ বলিয়া বুঝিতে পারিল না, রমেশ বলিয়া মনে করিল। এমন না হওয়াই অসম্ভব। যে ছাগ নির্ভয়ে হত্যাকারীর সঙ্গে তর্ক করে, ইংরাজী-বাংলা কোটেশন দেয় এবং প্রথম সুযোগেই হত্যাকারীকে হত্যা করিয়া গরম মশলা সহযোগে সুপক্ক ব্যঞ্জনে পরিণত করে—সে কি ছাগ! সে যে মানুষের পিতা!